শিকারের গল্প

মৃত্যুপথের যাত্রী, রত্নদ্বীপের বিভীষিকা
প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা

আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর

৩
০

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট্ লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

অগাষ্ট
১৯৫৭

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪.ঝামাপুকুর লেন,
কলিকাতা—৯

শিকারের গল্প

প্রথম পর্ব

—গ্রামে—

আমাদের ঝণ্টুদা ছিল অসাধারণ ডানপিটে। তার মত দুঃসাহসী, গোঁয়ার আশ-পাশের দশখানা গ্রামের মধ্যে বড় একটা কেউ ছিল না। প্রাণের ভয় যে কি, তা তার আদৌ জানা ছিল না। কোন অসমসাহসিকতার কাজে পশ্চাৎপদ হওয়া তার কোষ্ঠীতে লেখেই নি। বরং যে কাজে যত বেশী বিপদের সম্ভাবনা সেই কাজেই উৎসাহ ছিল তার তত অধিক।

নিজের নানা বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার কাজে ঝণ্টুদা আমাদের গ্রামটাকে রীতিমত সরগরম করে রেখে দিয়েছিল।

কিন্তু হঠাৎ একদিন সে একটা সাহেবের সঙ্গে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেল।

সাহেবটি একজন সার্ভেয়ার। ঝণ্টুদার সঙ্গে তাঁর কি রকম করে আলাপ হয়ে যায়। সাহেবও ঝণ্টুদার অসীম সাহসিকতা দেখে তার প্রতি কেমন আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

ঝণ্টুদার মা ছিলেন না। তার বাবাও ঝণ্টুদার দেশত্যাগের অল্প-দিন পূর্বে মারা যান। কাজেই ঝণ্টুদার সংসারে কোন বন্ধন ছিল না। সাহেবের অধীনে একটা ভাল চাকরি নিয়ে সে আফ্রিকায় চলে গেল। তার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামখানাও যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

সে আজ প্রায় দশ বৎসর আগেকার কথা। আমরা সকলেই

এই দীর্ঘকালের মধ্যে ঝণ্টুদার কথা একরকম ভুলতেই বসেছিলাম। এমন সময় দশ বৎসর পরে হঠাৎ একদিন হ্যাট্‌কোট্ পরে রীতিমত সাহেবী চালে সে গ্রামে ফিরে এল। তার আসবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামখানাতেও যেন একটা নূতন জীবনের সাড়া পড়ে গেল। প্রথম কয়েক দিন তার কাজ হল কেবল নানা লোকের কাছে তার দীর্ঘ প্রবাস জীবনের গল্প করা। আমরা গ্রামের ছাত্রদল একদিন তাকে ধরে বসলাম। ঝণ্টুদার মত শিকারী আর ভীষণ ডানপিটে ছেলে আফ্রিকার মত দেশে গিয়ে কি আর শান্ত শিষ্ট হয়ে ছিল? শিকার সে করেছে নিশ্চয়। বিশেষ যখন সে একজন সাহেবের সঙ্গী হয়ে সেখানে গিয়েছিল। আমরা তাকে শিকারের কাহিনী বলতে অনুরোধ করলাম।

আমাদের মধ্যে জনকতক নূতন সহাধ্যায়ী যারা ঝণ্টুদার পূর্বেকার বীরত্ব-কাহিনীও শোনে নি—তারা বললে, "শুধু আফ্রিকা কেন? আপনি দেশেও যা শিকার করেছেন, সে গল্পও করতে হবে।" অগত্যা সকলের অনুরোধ এড়াতে না পেরে ঝণ্টুদা আরম্ভ করলে :—

"দেখ তোমরা যখন ছাড়বেই না, তখন যথাসম্ভব সংক্ষেপে আমার কথা তোমাদের বলছি। তোমরা অনেকে জানো যে আমি বাল্যকাল হতেই খুব বলবান ছিলাম। খেতাম যেমন প্রচুর, শরীর চালনাও করতুম তেমনি। সব রকম জিম্‌ন্যাস্টিক আমার আয়ত্ত হয়েছিল। তা ছাড়া গাছে ওঠা, সাঁতারকাটা, ঘোড়াচড়া, এই রকম সব কাজেই আমার দক্ষতা হয়েছিল খুব। বন্দুক ছোঁড়ায় আমি ছিলাম সিদ্ধহস্ত। আমার লক্ষ্য এমন স্থির হয়েছিল যে কোন পাখি ছুটলে বা উড়ে গেলেও আমার হাত হতে নিস্তার পেত না। প্রথম

প্রথম পাখির ওপর দিয়েই শিকার অভ্যাস করি। তারপর ক্রমে ক্রমে খরগোশ, শিয়াল, বনবিড়াল, সজারু, ক্ষ্যাপাকুকুর, ভোঁদড় প্রভৃতি শিকার করতে লাগলুম। তখন আমার বয়স মাত্র চোদ্দ বছর। গ্রামের লোক সবাই বলতেন, "ঝণ্টু কালে খুব নামজাদা শিকারী হয়ে উঠবে।"

তাঁদের ভবিষ্যৎ বাণী সফল হবার সূত্রপাত হল আমার যোল বছর বয়সেই। তখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে ঘরে বসে আছি। পরীক্ষার ফল বেরুতে বিলম্ব আছে। কাজেই আর কোন কাজ না পেয়ে শিকারেই মেতে উঠলাম। প্রত্যহ শিকার। প্রত্যহ নানা স্থানে শিকারের অভিযান। ভোর ৪টার সময় কয়েকজন বন্ধু আর জন দুই চাষাকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে রওনা হতাম। আমাদের সঙ্গে প্রাতর্ভোজনের পাঁউরুটি, চিনি তো যেতোই, তা ছাড়া এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি, স্টোভ, আলু, পেঁয়াজ, মসলা, তেল ইত্যাদি রাঁধবার উপকরণ ও সরঞ্জামগুলিও নেওয়া হত। পথে ঘুঘু, পায়রা, ডাকপাখি, হরিয়াল ইত্যাদি ছোট জাতের পাখি যা চোখে পড়তো সেগুলো শিকার করতে করতে প্রায় দুই তিন ক্রোশ দূরে একটা না একটা বিলে গিয়ে উপস্থিত হতাম। সঙ্গীরা বিলের ধারে একটা বড় গাছের ছায়া দেখে সেখানে আড্ডা গেড়ে বসতো। সকলে মিলে প্রথমে বেশ করে জল-যোগ সেরে নিতাম। তারপর বন্ধুরা রাঁধবার আয়োজনে মাত্তো, আর আমি নেমে যেতাম বিলে। সে বড় সোজা কথা নয়। প্রকাণ্ড বিল, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে দু' ক্রোশের কম নয়। তার সবটাই হোগলা গাছ, সোলা গাছ, কলমী, দাম ইত্যাদি নানা জঙ্গলে ভরা। মাঝে মাঝে খানিকটা পরিষ্কার স্থান। বিলের জলে নানা বিষাক্ত সাপের বাস।

মেছো কুমিরও অনেক। তারই মধ্যে নেমে যেতাম শিকার করতে। দু' এক জন চাষা চাকর সঙ্গে যেত পাখি কুড়োতে। বিলে পাখিও বিস্তর—কায়েম, পাঁপড়া, বালিহাঁস, মাণিকজোড়, কাঁক, গয়াল, পানকৌড়ি, শামুকখোল, এই রকমের কত পাখি। এসব পাখি দেখলে কি আর সাপের কথা মনে থাকে? না কুমিরের ভয় আসে?

তিন চার ঘণ্টা ধরে সারা বিল তোলপাড় করে এই সব পাখি শিকার করতে হত। বিলের জল পরিষ্কার তো নয়ই, তার ওপর নানা বনজঙ্গলে ভরা। সহজে এক পা বাড়াবার যোটি নেই। প্রতিপদে ধারাল গাছ আর দাম ঠেলে এগুতে হয়। সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। তার ওপর মাঝখানের দিকটায় জলও কম নয়। কোথাও কোমর পর্যন্ত। আবার কোথাও বা বুক জল। বন্দুকের টোটা রুমালে বেঁধে হরিনামের ঝুলির মত গলায় ঝুলিয়ে, বন্দুক উঁচু করে ধরে, ঘুরে বেড়াতে হত।

যাহোক সেই রকম ভূতের মত পরিশ্রম করে এক বোঝা পাখি নিয়ে প্রায় দুটোর সময় তীরে উঠে আসতুম। ততক্ষণে বন্ধুরা ভাত আর মাংস রেঁধে বসে আছে। সকলে মিলে আনন্দ করে বনভোজন করতুম। সে-যে কি আনন্দ তা তোমরা হয়তো বুঝবে না।

ভারী আনন্দে দিন কাটত। কিন্তু তাতে মাঝে মাঝে বিপদে যে পড়তে হত না তা নয়। একদিন একটা বিলের মধ্যে কণির পাড়ে দাঁড়িয়ে কোথায় পাখি আছে দেখছি, এমন সময় একটা ফোঁস ফোঁস শব্দ কানে গেল। চেয়ে দেখি একটা প্রকাণ্ড কেউটে আমার

দশহাত দূরে ফণা তুলে গজরাচ্ছে। তার রাঙা চোখ দুটো যেন মণির মত জ্বলছে। সর্বনাশ! এখনি তেড়ে এসে একটা ছোবল দিলে আর রক্ষে নেই। তাড়াতাড়ি বন্দুকটা ফিরিয়ে ধরতেই সে আমার মতলব বুঝতে পেরে চকিতে মাথাটা নীচু করে নিয়ে, তীরের মত আমার দিকে ছুটে আসতে লাগলো।

যদি ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করতাম তা হলে সেদিন সেই বিলের মধ্যেই থেকে যেতাম। কারণ পালাবার স্থানও ছিল না। আর সময়ের তো কথাই নেই। দু' তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই সে আমার পায়ের কাছে এসে পড়ল। আমার মাথায় কে বুদ্ধি দিয়েছিল জানি না—আমিও খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বন্দুকের নল দিয়ে তার মাজাটা চেপে ধরলাম। সে তখন ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ফোঁস ফোঁস করে গজরাতে গজরাতে বারংবার সেই নলের উপরেই ছোবল দিতে লাগল। শেষে আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপ্‌তেই তার দেহটা দু'খণ্ড হয়ে গেল। তখনও তার কি তেজ! যাহোক সে যাত্রায় খুব রক্ষা পেয়ে ছিলাম।

আর একদিন শিকার করে বাড়ি ফিরছি। সেদিন বন্ধুরা কেউ সঙ্গে যায়নি, গিছল কেবল একটা বাগদীর ছেলে। আমি আপন মনেই চলেছি। বাগদীর ছেলেটি আমার দশ বার হাত পিছনে আসছে। একটা ঝোপের কাছাকাছি যেই এসেছি আর বাগদীটা চেঁচিয়ে বললে "দা-ঠাকুর! শোর, শোর।" চেয়ে দেখি একটা দাঁতাল বুনো শুয়োর তীরের মত আমার দিকে তেড়ে আসছে। সর্বনাশ! তখন বন্দুকে টোটা ভরা নেই। দেখলাম একটা গাছের ডাল আমার মাথার দু'হাত উপরে রয়েছে। তখনি লাফ দিয়ে এক হাতে ডাল ধরে পা দুটো উঁচ

করলাম। সেই মুহূর্তেই শুয়োরটা একটা কাল ধোঁয়ার তালের মত আমার পায়ের তলা দিয়ে ছুটে গেল।

কথায় বলে শুয়োরের গোঁ। মাথা নীচু করে তীরবেগে যখন তাড়া করে তখন হঠাৎ থামবার শক্তি তার থাকে না। লক্ষ্যচ্যুত হলে সে দৌড়ের ঝোঁকে অনেকটা এগিয়ে চলে যায়। হলও তাই। শুয়োরটা আমার পায়ের তলা দিয়ে এক ঝোঁকে বিশ হাত এগিয়ে গেল। সে ফিরে দাঁড়াবার আগেই আমি গাছ হতে লাফিয়ে পড়ে একটি বুলেট বন্দুকে ভরে নিলাম। সে যেমন ফিরে দাঁড়িয়ে আমাকে লক্ষ্য করতে যাবে, অমনি গুড়ুম। একেবারে ব্রহ্মতালু ভেদ হয়ে শুয়োরটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

দুমাস পরে ম্যাট্রিকুলেশনের ফল বের হল। দেখলাম আমি প্রথম বিভাগে পাস করেছি। বাবা বললেন, "আর শিকারে মেতে পড়ার ক্ষতি কর না। এইবার মন দিয়ে লেখাপড়া কর।" তিনি আমাকে রিপন কলেজে ভরতি করে দিলেন।

কলকাতা হতে আমাদের গ্রামের রেলস্টেশন মাত্র পনের মাইল। বাড়ি হতেই প্রত্যহ কলেজে যাতায়াত করতাম, আর প্রতি রবিবারে বা ছুটির দিনে শিকার করতাম।

একদিন দক্ষিণ পাড়ার হরিধন সংবাদ দিলে যে নতুন পুকুরে একটা প্রকাণ্ড কুমির এসে ভারী উপদ্রব করছে। প্রত্যহ সকালে সে জলের ধারে উঠে রোদ পোহায়। যেমন সংবাদ পাওয়া আর অমনি যাত্রা। পুকুরধারে গিয়ে দেখি সত্যই কুমিরটা ঘুমুচ্ছে। গুড়ি মেরে, ঝোপঝাপের আড়াল দিয়ে যতটা সম্ভব এগিয়ে একশো হাত দূর হতে তাকে গুলি করলাম। গুলিটা বিঁধলো গিয়ে তার কোমরে। কুমিরটাও ছট্‌ফট্‌ করতে



[illegible] কে দাডিয়েল বানর

করতে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে যেতে লাগল। আমিও ছুটে তার কাছে গিয়ে উপস্থিত। দেখলাম তার সব দেহটা ডুবে গেছে। কেবল লেজের অগ্রভাগটা জলের উপর জেগে রয়েছে। শিকার হাত ছাড়া হবে তা কি সহ্য হয়? টপ্ করে বাঁ হাত দিয়ে তার লেজটা ধরে ফেললাম। কুমিরটা পালাতে না পেরে আমার দিকে হাঁ করে তেড়ে আসতে লাগল আর কেবল ফ্যাঁস্ ফ্যাঁস্ করে একটা বিকট গর্জন জুড়ে দিলে।

কুমিরটা জখম হয়েছিল খুবই। তার কোমরটা গুলিতে একেবারে ভেঙে গিয়েছিল। তাই সে সম্পূর্ণরূপে বেঁকে তার মুখটা আমার কাছে আনতে পারছিল না। নইলে কি সে আমায় ছাড়ত?

যাহোক প্রায় পনের মিনিট তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করতে হল। পাড়ের উপর তখন প্রায় বিশজন লোক জড় হয়ে হল্লা শুরু করেছে। কিন্তু আমার কাছে এসে আমাকে সাহায্য করতে কারও সাহস হয়নি। শেষে কুমিরটা বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন তাকে টানতে টানতে উপরে নিয়ে এলাম। তারপর সকলে মিলে ইট, বাঁশ, লাঠি ইত্যাদির সাহায্যে তাকে মেরে ফেললে। কুমিরটা খুব বড় না হলেও লম্বায় এগার হাত।

আই-এ পরীক্ষা দেবার আগে যে রকম বিপদে পড়েছিলাম সে রকম বিপদ থেকে বড় একটা কেউ রক্ষা পায় না! উঃ! সে কী ব্যাপার! তখন সকাল ৭টা হবে। আমি বৈঠকখানা ঘরে বসে পড়ছি। এমন সময় পেঁচো বাগদী এসে বললে,"দা-ঠাকুর! গাঁয়ে বাঘ এসেছে। কাল রাতে মহেন্দ্র ঘোষের গোয়ালে ঢুকে তিনটে গরু মেরেছে, আর একটাকে নিয়ে গেছে। গোয়ালারা মহা হৈচৈ বাধিয়েছে।" আমি বললাম, "বলিস কি? বাঘ? কেউ চোখে দেখেছে?" পেঁচো বললে, "দেখবে কি দা-ঠাকুর! দেখলে কি আর রক্ষে ছিল? তার থাবার দাগ দেখেই

সবার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে।” আমি হেসে বললাম, “আচ্ছা, আচ্ছা, তাকে আর গরু মারতে হবে না। আজই তাকে শেষ করছি। তুই যাবি আমার সঙ্গে?” সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, “না দা-ঠাকুর! আমি তা পারব না। আমি মায়ের এক ছেলে। শেষে কি বাঘের হাতে প্রাণটা দেব?” পাছে বেশী পীড়াপীড়ি করি তাই সে তখনি চলে গেল। আমি ভাবলাম তবে আর দেরি কেন? বেরিয়ে পড়ি। যেই ভাবা, সেই কাজ। লুকিয়ে বন্দুক, টোটা নিয়ে, ভোজালি-খানা কোমরে বেঁধে একাই বেরিয়ে পড়লাম বাঘ শিকার করতে। জানোই তো আমি দুরন্ত গোঁয়ার। তার উপর দু-একটা শুয়োর মেরে বুকের পাটা বেড়ে গিয়েছে। ভাবলাম বাঘও মারব ওই রকম অক্লেশে। সত্য কথা বলতে কি, আমি সেই অপরিচিত আগন্তুক বাঘটাকে একটা ক্ষুদ্রকায় গো-বাঘ অর্থাৎ চিতাবাঘ বলেই ভেবেছিলাম।

বন্দুক নিয়ে তার খোঁজে চললুম। আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিকে শুঁটী নদী। তাতে জল কখন থাকে না। আছে কেবল তার ধারে ধারে ঘন বেতবন। ভাবলাম ওই দিকে গেলেই বাঘের সন্ধান পাব। সেই দিকেই পা চালিয়ে দিলাম।

যাবার পথে গ্রামের শেষভাগে তিমু ঘোষালের পতিত ভিটে। ভিটেটা জঙ্গলে ভরা। একখানি কোঠাঘর অতি কষ্টে দাঁড়িয়ে আছে। তার ছাদের অর্ধেকটা ঘরের মধ্যেই ভেঙে পড়েছে। জানলাগুলোর লোহার গরাদে ঠিক আছে কিন্তু তার কপাটগুলো নেই। দোরটা খুব মজবুত বলে এখন ঠিক আছে। উঠানে জঙ্গল। ঘরের মধ্যেও আগাছা জন্মেছে। মনে করলাম ভিটেটা দেখে যাই।

একটু এগুতেই বাঘের গায়ের গন্ধ নাকে গেল। বুঝলাম বাঘটা

এইখানেই কোথাও আড্ডা নিয়েছে। বন্দুক বাগিয়ে ধরে নিঃশব্দে ঘরটার কাছে গেলাম। দরজাটি খোলা হা হা করছে। উঁকি মেরে দেখলাম ওরে বাবা! এ গো-বাঘ নয়—একেবারে সাক্ষাৎ ডোরা বাঘ। আমার বুকটা কেঁপে উঠল। বাঘটা আরামে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তবু গুলি করতে সাহস হল না। কি জানি যদি গুলি সাংঘাতিক না হয়? যদি এক গুলিতে সে কাবু না হয়? তা হলে কি আর রক্ষে আছে? মনে করলাম পালাই! কিন্তু তাতেও সাহস হল না। কি জানি যদি পালাতে গিয়ে গাছের পাতা বা কোন জঙ্গল পায়ে লেগে শব্দ হয়? আর তাইতে বাঘটা জেগে ওঠে?

আমি যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। হঠাৎ মাথায় একটা উপস্থিত বুদ্ধি জাগল। যদি সাবধানে কপাট দুটো টেনে দোরটায় শিকল টেনে দি? তা হলে তো বাঘটাকে বন্দী করা যেতে পারে। সাহসে ভর করে দু-হাত দিয়ে দুটি কপাট ধীরে ধীরে টানলাম। কপাট দুটো ঠিক সরে এল, কিন্তু শিকলটা হঠাৎ বেজে উঠল। বাঘটা অমনি জেগে উঠে ড্যাব্ ড্যাব্ করে আমার দিকে চেয়ে তার ভীষণ দাঁতগুলো বার করে গজরে উঠল। আমার তো প্রাণ খাঁচা ছাড়া। সেই মুহূর্তে কপাট টেনে শিকল এঁটে দিলাম। বাঘটাও বন্দীদশা বুঝতে পেরে একলাফে দরজার উপর এসে পড়ল। তারপর সে ভীষণ গর্জন করতে করতে লাফিয়ে পাঁচিলের ওপর ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল।

আমি দেখলাম মুশকিল। যদি সে পাঁচিলেই ওঠে তা হলে সে নিশ্চয় আমার ঘাড়ে এসে পড়বে। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে আমি ছুটে একটা পুকুরের কাছে গেলাম। বাঘটা পাঁচিলে উঠতেই

আমি বন্দুকটা তীরে ফেলে রেখে ঝাঁপিয়ে জলে পড়লাম ও সাঁতরে একেবারে মাঝখানে চলে গেলাম। বাঘটাও ঠিক সঙ্গে সঙ্গে পুকুর ধারে এসে পড়ল। তখন সে একবার জলের ধারে নেমে আসে, আবার ওপরে উঠে যায়, আর নিস্ফল আক্রোশে কেবল দাঁত বার করে গজ্‌রাতে থাকে। এক একবার তার গতিবিধি দেখে মনে হয় বুঝি সে জলেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ে আমাকে আক্রমণ করতে আসবে। কিন্তু কি জন্যে জানি না সে সেরূপ চেষ্টা করলে না। সে কেবল পুকুরের চারপাশে ঘুরে বেড়ায় আর এক একবার জলে নামবার উপক্রম করে।

এই রকমে প্রায় বিশ মিনিট কেটে গেল। আমি তো প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে প্রাণপণে হাত পা নেড়ে পুকুরের মাঝখানটিতে কোনরকমে দেহটা ভাসিয়ে রাখলাম। কি যে করব কিছু ভেবে উঠতে পারলাম না। হঠাৎ দেখলাম বাঘটা খুব অস্থিরতা প্রকাশ করছে। তার যেন আর বিলম্ব সইছে না। একটা সামান্য মানুষ তাকে ঠকিয়ে এমনভাবে এতক্ষণ ধরে মুখের গ্রাস হতে বঞ্চিত করে রাখবে এটা সে আর সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। সে জলের ধারে নেমে সাঁতরে আমার কাছে আসবার সংকল্প করলে! তারপর সত্যসত্যই সে জলে নেমে পড়ল আর আমাকে লক্ষ্য করে সাঁতার শুরু করলে।

আমি দেখলাম সর্বনাশ। আর তো রক্ষা নেই। তখন যথাসাধ্য দ্রুত বেগে সাতরে তীরে এসে উঠলাম। এক দৌড়ে বন্দুকটা কুড়িয়ে নিয়ে যখন পুকুর ধারে এলাম তখন বাঘটা মাঝখান পার হয়ে খানিকটা এগিয়ে এসেছে। তখন আমায় পায় কে? তার ভাসমান মস্তকটি লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লাম! বাঘটা যন্ত্রণায় বিকট চিৎকার করে জল

তোলপাড় করে তুললে। আমি সঙ্গে সঙ্গে আর একবার আওয়াজ করলাম গুড়ুম্।

তারপর লোকজনের সাহায্যে সেই প্রকাণ্ড ব্যাঘ্ররাজকে বাঁশে বেঁধে নিয়ে কোলাহল ও আনন্দে চিৎকার করতে করতে যখন গ্রামের বড় রাস্তায় উপস্থিত হয়েছি, তখন দেখি একজন সাহেব মটরকার চালিয়ে আসছেন। আমাদের শোভাযাত্রা দেখে তিনি গাড়ি থামিয়ে আমাদের কাছে এলেন এবং সেই প্রকাণ্ড বাঘটিকে দেখে মহাবিস্মিত হয়ে পড়লেন। বাঘ শিকারের বৃত্তান্তটা সব তাঁকে বললাম। তিনি মহাখুশী হয়ে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন, "বাহবা! সাবাস! তোমার মত সাহসী বালক খুব কমই মেলে।" তারপর তিনি আমার সমস্ত পরিচয় নিয়ে সরকারী ডাক-বাঙলোয় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে আমাকে বারংবার অনুরোধ করলেন।

সেই হতে সাহেবের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। সাহেবটি নিজে একজন ভাল শিকারী। আমার এই অল্প বয়সে এমন দুঃসাহস আর শিকার-দক্ষতা দেখে তিনি আমাকে খুব ভালবাসতে লাগলেন।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় আমি তাঁর বাঙলোয় যেতাম আর দু'তিন ঘণ্টা ধরে তাঁর সঙ্গে গল্প করতাম। তিনিও আমাকে নানা জন্তু শিকারের গল্প বলতেন। আমি খাওয়া-দাওয়া ভুলে সেই সব গল্প শুনতাম।

একদিন তিনি আমাকে নিয়ে একটা জঙ্গলে বুনো শুয়োর শিকার করতে গেলেন। সাহেবের হাতে রাইফেল আর আমার হাতে ছিল একটা বর্শা। একটা নীচু স্যাঁতসেঁতে জায়গায় একসঙ্গে চার পাঁচটা শুয়োর কচু গাছের গোড়া খুঁড়ছিল। দূর হতে সাহেব একটাকে গুলি করলেন। সেটি তখনি পড়ে গেল বটে, কিন্তু আর একটা অতি

প্রকাণ্ড শুয়োর একেবারে বিদ্যুতের মত বেগে আমাদের তাড়া করলে। আমাদের মনে হতে লাগল যে একটা ধোঁয়ার তাল বেগে ছুটে আসছে। সাহেব আর লক্ষ্য করবার অবসর পেলেন না। মাত্র তিন চার সেকেণ্ড। তার মধ্যেই জন্তুটা আমাদের কাছে এসে পড়ল। সাহেব একটু সরে, দাঁড়াতে গিয়ে একটা গাছের শিকড়ে বেধে পড়ে গেলেন। সর্বনাশ ! শুয়োরটা তাঁকে দাঁত দিয়ে ফেড়ে ফেলে আর কি। আমি যেন মরিয়া হয়ে হাতের বর্শাটা ছুড়ে মারলাম। বর্শাটি শুয়োরের বুকে বিঁধে একেবারে অপর দিকে একহাত বেরিযে পড়ল। শুযোরটাও তখনি মুখ থুবড়ে পড়ল। সেই স্নযোগে সাহেব উঠে গুলি করে সেটাকে মেরে ফেললেন।

সে যাত্রা আমার দ্বারাই সাহেবের প্রাণ রক্ষা হল মনে করে তিনি আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

এই ঘটনার এক মাস পরে হঠাৎ তিন দিনের জ্বরে বাবা মারা গেলেন। আমি দু-চোখে অন্ধকার দেখলাম। মাথার ওপর আমার অভিভাবক কেউ রইলো না।

বাবার বর্তমানে, যেন পাহাড়ের আড়ালে ছিলাম। এখন একেবারে পথে বসলাম। বাবা রোজগার করতেন খুব ! কিন্তু এত অধিক ব্যয় করতেন যে সঞ্চয় কিছু রেখে যেতে পারেন নি। কোন রকমে তাঁর শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করলাম। তারপর কি করবো তাই বসে বসে ভাবছি এমন সময় সাহেবের আরদালী এসে হাজির। সে বললে, সাহেব আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। কালবিলম্ব না করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। সাহেব আমার কথা শুনে খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন।

সেই দিনই সাহেবের অধীনে আমার চাকরী ঠিক হয়ে গেল। সাহেব নিজে সার্ভেয়ার। সরকারের অধীনে খুব মোটা মাইনে পান। এ দেশের কাজ তাঁর শেষ হয়ে গিয়েছে। এইবার তাঁকে আফ্রিকায় যেতে হবে। এখন তিনি তিন মাসের ছুটিতে আছেন। এই তিন মাস সুন্দরবন অঞ্চলে আর আসামে শিকার করে বেড়াবেন। তারপর তিন মাস বাদে আফ্রিকায় চলে যাবেন।

এক সপ্তাহ বাদে তল্পিতল্পা বেঁধে আমরা শিকারের উদ্দেশ্যে সুন্দর-বনের দিকে রওনা হলাম।

দ্বিতীয় পর্ব

—সুন্দরবনে—

হাসনাবাদ থেকে একটা ছোট স্টীম্‌লঞ্চে আমরা সুন্দরবনের দিকে যাত্রা করলাম। লঞ্চে সাহেব, আমি, সাহেবের আবদালী, আর আটজন সাহেবের লোক। হাসনাবাদ হতে দুজন ওই অঞ্চলের লোককে সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল।

চওড়া গাঙের উপর দিয়ে তিন চার ঘণ্টা যাবার পর আমাদের স্টীম্‌লঞ্চ একটা অল্পপরিসর শাখানদীতে প্রবেশ করল।

সন্ধ্যার পূর্বেই আমরা সুন্দরবনের কাছাকাছি উপস্থিত হলাম। অস্পষ্ট আলোয় দূরে দূরে এক একটি বড় বড় গাছ আর মধ্যে মধ্যে খানিকটা জঙ্গল চোখে পড়তে লাগলো। নদীর দুই ধারে লতাগুল্মের বন আর লম্বা লম্বা খড় ও ঘাসের রাজত্ব। আসল সুন্দরবন সে স্থান হতে আরও ৬।৭ ঘণ্টার পথ। কিন্তু এখান হতেই মাঝে মাঝে মেঘ

গর্জ্জনের মত দু একটা বাঘের ডাক যা কানে আসতে লাগলো তাইতেই চক্ষু স্থির। সে কি ডাক! সে ডাকে বুকের মধ্যে গুর্ গুর্ করে ওঠে। অতি দুঃসাহসী লোকেরও প্রাণ কেঁপে ওঠে। বুঝলাম সাক্ষাৎ যমের রাজত্বেই এসে পড়েছি।

সে রাত্রে আর বেশী দূর যাওয়া হলো না। মাঝ নদীতে লঞ্চটিকে নোঙর করে আমরা আহারাদির ব্যবস্থা করতে লাগলাম। লঞ্চের দুই ধারে তীরের দিকে দুজন সর্বদাই পাহারা দিতে লাগলো। কি জানি যদি কোন বাঘ মানুষের রক্ত লোভে সাঁতার দিয়েই লঞ্চে এসে ওঠে।

যে নদীতে আমরা লঞ্চটিকে নোঙর করেছিলাম সেটি একটি চওড়া খাল মাত্র। তার বিস্তার বড় জোর দেড়শো হাত।

আমাদের লঞ্চের দুই ধারে পঁচাত্তর হাতের বেশী জল ছিল না। মধ্যে মধ্যে দু একটি বৃহৎ আকার বাঘ তীর হতে লোলুপ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে হ্যা হ্যা করে ভীষণ আওয়াজ ছাড়ছিল। টর্চের আলো মুখে পড়তেই সপ্রতিভভাবে বনের আড়ালে গা ঢাকা দিচ্ছিল।

সে রাত্রে ঘুম আর কারও চোখে এল না। যেই একটু তন্দ্রা আসে, আর অমনি সেই মেঘ ডাকার মত ভীষণ আওয়াজ। তন্দ্রা ছুটে বুক গুর্ গুর্ করে ওঠে। অর্ধেক রাত্রে উঠে দেখি একটা প্রকাণ্ড বাঘ তীরে বসে একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। সাহেব তার আগুনের ভাঁটার মত দুটো চোখ লক্ষ্য করে অন্ধকারেই রাইফেল ছুড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চিৎকার করে বাঘটা প্রায় পনের হাত দূরে জলে এসে পড়লো।

সে রাত্রিটা এমনিভাবেই কাটলো। ভোরের দিকে সবাই একটু

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। চোখ চেয়ে দেখি বেশ রৌদ্র উঠেছে। বেলা তখন সাতটা। আমরা চা ও জলখাবার খেয়ে বনের ভিতরের দিকে এগুতে লাগলাম। বেলা বারটা নাগাদ সুন্দরবনে প্রবেশ করলাম।

সে কি ভয়ানক স্থান! খালের দুই ধারে সারি সারি প্রকাণ্ড সুন্দরী গাছ। দিন দুপুরেই মনে হয় যেন একটা অন্ধকারের রাজত্বে চলেছি। খালের উপর হতে যতদূর দৃষ্টি চলে কেবল ভীষণ জঙ্গল। মাঝে মাঝে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তাও আবার নানা গুল্মলতা, আর ক্যাওড়া গাছে ভরা। কথায় বলে ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর। এখানে ঠিক তাই। খালের ধারে ধারে কত কুমীর যে দেখলাম! এক একটি যেন প্রকাণ্ড খেজুর গাছ। আমাদের লঞ্চের আশে পাশে খালের জলেও অনেকগুলোকে ভাস্‌তে দেখলাম।

লঞ্চটিকে নোঙর করবার জন্যে আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি এমন সময় একজন কুলি লঞ্চ থেকে ঝুঁকে পড়ে খাল থেকে এক বাল্‌তি জল তুলতে গেল। আর যায় কোথা? হঠাৎ একটা কুমীরের ল্যাজের ঝাপটায় সে জলে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড কুমীর গপ্‌ করে তাকে ধরে ফেললে।

শিকার আরম্ভ করার পূর্ব্বেই এমন ভাবে একজন অনুচরকে হারাতে হলো দেখে সকলেই অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। যা হোক মন দৃঢ় করে নিয়ে আবার আমরা কাজে লেগে গেলাম।

একস্থানে দেখলাম খালের দুপাশ অনেক দূর পর্য্যন্ত ফাঁকা। আমরা সেইখানেই খালের মাঝখানে স্টীম্‌লঞ্চটিকে নোঙর করলাম। তারপর তাড়াতাড়ি আহারাদি সেরে নিয়ে সদলবলে ছোট একখানি

বোটের সাহায্যে তীরে পদার্পণ করলাম। লঞ্চে কেবল সাহেবের আরদালী আর একজন রসুইকর থাকলো।

তখন বেলা দেড়টা। সাহেব বললেন, "আজ আর বেশী দূর যাবার প্রয়োজন নেই। এই ফাঁকার দিকটায় অনেক হরিণ পাওয়া যাবে। আহার সংস্থানের জন্যে তারই দু একটা মেরে নিয়ে ফিরবো।"

দলবল নিয়ে ধীরে ধীরে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। সাহেব ও আমার হাতে দুইটি রাইফেল। সঙ্গের লোকদের কারও হাতে বর্শা, কারও হাতে টাঙি, কারও হাতে ছোরা, আবার কারও হাতে বা লাঠি। আমাদের দেখে মাথার উপর গাছের ডালে ডালে অসংখ্য বানর মহা লাফালাফি সুরু করলে। এত বানরও সুন্দরবনে থাকে। আমরা যথাসম্ভব নিঃশব্দে চলেছি,—হঠাৎ সাহেব ইঙ্গিত করে বললেন, "চুপ।" আমরা অমনি দাঁড়িয়ে গেলাম। দূরে একটা প্রকাণ্ড ক্যাওড়া গাছের দিকে আঙুল বাড়িয়ে সাহেব বললেন, "ওই গাছে অনেক বানর কিচিমিচি করছে আর গাছের পাতা ভেঙে নীচে ফেলছে। নিশ্চয় ওখানে হরিণের পাল আছে।" দেখলাম সাহেবের কথাই ঠিক। গাছের তলায় আট দশটি হরিণ মনের সুখে ক্যাওড়া পাতা খাচ্ছে। ঝোপের আড়ালে কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে সাহেব ও আমি এক সঙ্গে রাইফেল তুললাম। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ হতেই দুইটি বৃহদাকার হরিণ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

প্রথম উদ্যমেই কৃতকার্য্য হয়েছি বলে মনে খুব আনন্দ হলো। কুলিদের সঙ্গে নিয়ে শিকার দুটো কুড়িয়ে আনতে গেলাম। হরিণ দুটির কাছে বরাবর গিয়েছি এমন সময় ভয়ানক গর্জ্জন করে একটা

বাঘ আমাদের দলের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। চক্ষের নিমেষে সে একটা হতভাগ্য কুলিকে মুখে নিয়ে ঝড়ের মত কোথায় যেন মিশিয়ে গেল।

আমরা সকলেই ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। সেই হতভাগ্যকে অন্বেষণ করা বৃথা জেনে আর কোন চেষ্টা করলাম না। হরিণ দুটোকে নিয়েই লঞ্চে ফিরে এলাম।

হরিণের মাংস আর বাসি পাঁউরুটী খেয়ে সে রাতটা লঞ্চেই কাটিয়ে দিলাম।

প্রত্যূষে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের একখানি প্রকাণ্ড বোট্ এসে হাজির। বোট্খানিতে দুজন লাল মুখ আর অনেকগুলি দেশীয় কুলি দেখলাম। সাহেব দুটি আমাদের লঞ্চ দেখে বিস্মিত হয়ে তদারক করতে এলেন, তারপর আমাদের সাহেবের পরিচয় আর শিকারের পাশ দেখে তাঁর সঙ্গে ভাব করে ফেললেন।

সাহেব তিনজন একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট করতে বসে শিকারে যাবার ফন্দি আটলেন।

বেলা নয়টার পূর্ব্বেই দুই দলের লোকজন সব একত্র হয়ে মস্ত বড একটা দল বেধে শিকার করবার জন্যে গভীর বনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

কি গভীর বন! ঘন সন্নিবিষ্ট প্রকাণ্ড সুন্দরী গাছের শ্রেণী শাখায় শাখায় জড়াজড়ি করে পরস্পর পরস্পরকে যেন আলিঙ্গন করছে। তার ওপর নানা জাতীয় লতা, গাছের শাখাগুলিকে এমনভাবে ঘিরে বেধেছে যে দিন-দুপুরেও সেখানে সূর্য্যের রশ্মি ঢুকতে পারে না। কোথাও বা ক্যাওড়া, বাবলা, সাঁই ও আরও কত গাছ একসঙ্গে যেন তাল পাকিয়ে রয়েছে। বনের ভিতরটা ভয়ানক গম্ভীর—ঢুকলেই

যেন গা ছম্‌ছম্‌ করে। আমরা দলে ভারী হলেও ভয়ে, সন্তর্পণে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

হঠাৎ আমাদের দক্ষিণ পাশের জঙ্গল থেকে একটা বাঘ গর্জ্জন করে আমাদের সুমুখে লাফিয়ে পড়লো। আমরা তাড়াতাড়ি বন্দুক তোলবার আগেই সে আর একটা প্রকাণ্ড লাফ দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

তাকে অনুসরণ না করে আমরা বাঁ দিকে চলতে লাগলাম,—কারণ বাঁ দিকের জঙ্গলটা কিছু পাত্‌লা। সেই দিকেই শিকারের সুবিধা। কিছু দূর যেতে না যেতেই আমাদের সাহেব হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে তাঁর রাইফেল তুলে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ হলো গুড়ুম। চেয়ে দেখি দূরে ক্যাওড়া গাছের তলায় একটা বাঘ মাটিতে পড়ে ছট্‌ফট্‌ করছে। গুলি একেবারে তার মাথায় বিঁধেছে বলে বাঘ ভায়া উঠে দাঁড়িয়ে আর জারিজুরি করতে পারছেন না।

বাঘের জাত, বিশ্বাস নেই। আর একটু এগিয়ে গিয়ে সাহেব তাকে আর একটা গুলি করতেই সে একেবারে স্থির।

বাঘটাকে দড়ির সাহায্যে একটা ক্যাওড়া গাছের উঁচু ডালে ঝুলিয়ে রেখে আমরা আবার সুমুখ দিকে এগিয়ে চললাম।

একটুখানি যেতে না যেতেই ফেউএর ডাক কানে এল। বুঝলাম নিকটেই বাঘ আছে। আমরা খুব সাবধান হয়ে চলতে লাগলাম। যে ঘন জঙ্গল, তাড়াতাড়ি যাবার কি উপায় আছে ?

আমাদের একটু আগে দু'তিনটে সুন্দরী গাছ জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। তার ওধারে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সুন্দরী গাছ তিনটার গোড়ায় পৌঁছেই দেখতে পেলাম একটা প্রকাণ্ড বাঘ আর একটা বাঘিনী দাঁড়িয়ে আছে একসঙ্গে।

বাঘটা গর্জ্জন করতে করতে মাটি আঁচড়াতে সুরু করলে আর বাঘিনী দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গোঙরাতে লাগলো। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান হতে তাদের গুলি করার সুবিধা হলো না। কারণ তারা দুটোই আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের দূরত্ব আমাদের কাছ হতে প্রায় চারশো হাতের ওপর। এত দূর হতে কেবল মাথাটি লক্ষ্য করে গুলি করলে হয়তো লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে। তাই আর একটু এগিযে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত বলে সবাই মনে করলেন।

পরামর্শ মত আমার সাহেব আর আমি বাঘিনীর দিকে লক্ষ্য রাখলাম। ফরেস্টার সাহেবেরা বাঘটিকে হত্যা করবেন বললেন। যা হোক আমরা চারজন দুই দলভুক্ত হয়ে কুলিদের নিয়ে একটু একটু করে এগিযে যেতে লাগলাম।

আমাদেব দেখে বাঘিনীটা একলাফে বনের ভিতর ঢুকে পড়ল। তাকে শিকার করা আমাদের ভাগ্যে হলো না।

বাঘিনীটার সন্ধানে সুমুখের ও আশপাশের ঝোপ-ঝাপ তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে চলেছি। সবাই মনে করলে সেটা ভয় পেয়ে সে অঞ্চল ছেড়ে পালিয়েছে।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে চলতে লাগলাম। সুন্দরবনের ব্যাপার তো আমি জানি না। অন্যমনস্ক হয়ে চলেছি এমন সময় হঠাৎ নিকটবর্ত্তী একটা ঘাসের ঝোপ থেকে বাঘিনীটা আমার ঘাড়ে পড়ে কামড়ে ধরে চক্ষের নিমিষে আমাকে শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে চললো।

আমার গায় একটা মোটা গরম কোট, আর তার উপর একটা ওভারকোট ছিল। সেই দুইটি জামায কামড় দিয়ে সে আমাকে টেনে নিয়ে চললো।

বাঘের হাতে পড়া যে কি রকম ব্যাপার ত' যে পড়েছে সেই জানে। আমার অদম্য সাহস, বল, সব যেন কোথায় উড়ে গেল।

ভয়ে আমার হাত হতে রাইফেলটিও কোথায় পড়ে গেল।

আমি বিড়ালের মুখে ছোট ইঁদুর ছানাটির মত নিস্পন্দ অসাড় হয়ে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে বহুদূর চললাম।

অল্পক্ষণ পরে বাঘিনীটা একটা ফাকা জায়গায় আমাকে নামালে। সেখানে চারিধারে বিশ পঁচিশ হাতের মধ্যে গাছ একটিও নেই। কেবল স্থানে স্থানে এক রকম লম্বা ঘাসের ঝোপ।

আমাকে মাটিতে ফেলে বাঘিনীটা একবার চারিধারে দৃষ্টিপাত করে নিলে। তারপর সে আমার দিকে ফিরলে। বুঝলাম এইবার সে হয় একটি থাবায় আমার ঘাড়টি ভেঙে ফেলবে না হয় এক কামড়ে আমার টুঁটি ছিঁড়ে রক্ত চুষে খাবে।

বাঘিনীটা কিন্তু তখনি আমাকে আক্রমণ করলে না। সে একবার এপাশে একবার ওপাশে লাফালাফি করে যেন আমাকে নিয়ে খেলা করতে লাগলো। বাঘিনীর খেলা দেখে, প্রতিক্ষণে তার নিষ্ঠুর আক্রমণের প্রতীক্ষা করছি, এমন সময় এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল।

আমার পাশেই একটা ঘাসের ঝোপ ছিল। তার ভিতর হতে একটা প্রকাণ্ড সাপ ফোঁস করে একেবারে মানুষ সমান ফণা তুলে দাঁড়ালো আর সঙ্গে সঙ্গে বাঘিনীটার মাথায় ছোবল বসিয়ে দিলে। বাঘিনীটাও সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। সাপটি আমাকে কিছু না বলে ঘাসের ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল।

আমি আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করলাম না, দাঁড়িয়ে উঠে এক দিকে ছুটলাম।

কিছুদূর ছোট্‌বার পর আমি আমার ভুল বুঝে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তাইতো! কোনদিকে যাব? আমার দলবল কোন দিকে আছে তা জানি না। তাদের কাছ হতে কতদূরে এসেছি তাও আমার জানা নেই। এমন লক্ষ্যশূন্য ভাবে এই সাক্ষাৎ যমের রাজত্বে এক পা যেতে না যেতে আবার হয়তো বাঘের হাতে পড়তে পারি। হাতে রাইফেল নেই, সঙ্গে কোন অস্ত্র নেই যে তাই দিয়ে আত্মরক্ষা করবো। তবে?

এক পা আর এগুতেও সাহস হলো না। নিকটেই একটা প্রকাণ্ড পাকুড় গাছ ছিল। আমি তাড়াতাড়ি সেই গাছে উঠে পড়লাম।

মাত্র হাত-দশেক উপরে উঠেছি এমন সময় দেখি একটা বাঘ সেই গাছের তলায় এসে হাজির। সে আমাকে দেখে মহা তম্বি করতে লাগলো। আমি আরও উঁচুতে উঠে, দুইটি মোটা ডালের মাঝখানে বসে, ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে রইলাম।

এমনি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগলো। নীচে বাঘ আর উপরে আমি।

নামবার উপায় নেই। পরিত্রাণের আশা নেই। বাঘটা একবার এদিক, একবার ওদিক করে ঘুরে বেড়ায় আর মাঝে মাঝে নিতান্ত অসহিষ্ণুর মত গাছে ওঠবার জন্যে গাছের গুঁড়ি আঁচড়াতে থাকে।

ক্রমে সন্ধ্যা এসে গেল। কাকপক্ষের মত মিশ্‌ কালো অন্ধকার আমার চারিদিকে জমাট হয়ে এল। যেদিকে চাই গাঢ় অন্ধকার। কেবল মাথার উপর নীল আকাশের গায় অসংখ্য নক্ষত্র মিট্‌ মিট্‌ করে জ্বলছে।

তৃষ্ণায় বুক শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। সারা দেহ ঝিম্‌ ঝিম্‌ করে

গাছ হতে পড়ে যাবার মত অবস্থা হলো। উপায়ান্তর না দেখে, ওভার-কোট্‌টা খুলে গাছের ডালের সঙ্গে নিজেকে বেশ করে বাঁধলুম।

বাঘটার কি ধৈর্য্য! কি অসীম অধ্যবসায়! সে সারারাত আমার পেছনেই লেগে রইলো। মাঝে মাঝে নীচের দিকে চাই আর তার আগুনের আঙরার মত জ্বল্‌জ্বলে চোখ দুটো দেখে প্রাণ শিউরে ওঠে।

ক্ষিদে তৃষ্ণার জ্বালা এত বাড়লো যে, ভাবলুম বুকের ভিতরটা বুঝি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। মনে হলো নিজের দেহ কামড়ে নিজের রক্ত চুষে খাই। উঃ। সে যে কি যন্ত্রণা।

শেষ রাত্রে হঠাৎ গাঢ় মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে কি ঝড়! এক একটা দম্‌কা হাওয়া আসে আর গাছের ডাল হতে আমাকে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়।

ঝড়ের সঙ্গে মুষল ধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হলো। আমার সারা দেহ ভিজে চ্যাব-চেবে হয়ে গেল!

একে শীতকাল। তার উপর এই বৃষ্টি। আমার শরীর দারুণ শীতে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো। মনে হলো বুঝি কাঁপুনির চোটে হার্টফেল হয়েই যায়।

ঘণ্টাখানেক পরে ঝড়বৃষ্টি থেমে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। পূবের আকাশ যেন ফর্শা হয়ে এল। তখনো আমার কাঁপুনি যায় নি। অনেক কষ্টে এক এক করে গায়ের জামাগুলো খুলে ফেললুম। তারপর সেই জামা নিংড়ে জল খেয়ে দারুণ তৃষ্ণার জ্বালা কমিয়ে নিলুম। শরীরটাও একটু সুস্থ হলো।

সকাল হয়ে গেল। আকাশে সূর্য্যোদয় হলো। একটু একটু সূর্য্য-কিরণ আমার গায়ে এসে পড়তে শীতটা প্রায় চোদ্দ আনা কমে এলো।

ঝড়বৃষ্টির সময় বাঘটা বোধ হয় সরে পড়েছিল। কারণ বহুক্ষণ তার কোন আওয়াজ পাইনি। কিন্তু সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সে এসে হাজির।

বুঝলাম আর রক্ষা নেই। হয় এর পেটেই যেতে হবে, না হয় এই গাছের ডালে বসে বসে মরতে হবে। তারপর শকুনির পাল এসে আমার মৃতদেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে।

এমনি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে লাগলো।

আবার সন্ধ্যা এল। জমাট কালো অন্ধকারে পৃথিবী ছেয়ে গেল। রাত্রি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিদে তৃষ্ণায় মরার মত হয়ে আমি সেই গাছের ডাল আঁকড়ে বসে রইলাম। বাঘটার দাপাদাপি পূর্ব্ব রাত্রের মতই চলতে লাগলো।

তারপর যখন সকাল হলো তখন আর আমি সহ্য করতে পারলাম না। ভাবলাম এ রকম তিলে তিলে মরার চেয়ে বাঘের হাতে মরাই শ্রেয়ঃ। এক নিমিষে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে, সে আর কতক্ষণের কষ্ট? মরতেই যখন হবে, মরা ছাড়া যখন আর উপায় নেই, তখন এ রকম করে মরার চেয়ে সে মরণ শতগুণে শ্রেয়ঃ।

ভাবতে ভাবতে ওভারকোটের বাঁধনটা খুলছি এমন সময় হঠাৎ পূবদিকে রাইফেলের আওয়াজ শুনতে পেলাম। আওয়াজটা ক্ষীণ। বোধ হয় অন্ততঃ আধ মাইল দূরে কেউ বন্দুক ছুঁড়ে থাকবে।

প্রাণে একটা ভরসা এল। তবে তো আমার সাহেব এখনও সুন্দরবনে আছেন। এখনও তিনি শিকার করে বেড়াচ্ছেন। হয় তো তিনি দলবল নিয়ে এইদিকে এসে পড়তেও পারেন। এই কথা ভাবতেই আমার প্রাণে একটা নতুন আশা দেখা দিলে। মনে হলো আবার আমি বাঁচবো। আবার আমার দলে গিয়ে মিশতে পারবো।

কিন্তু ক্ষিদের জ্বালা, আর কোন প্রবোধই মানতে চাইছিল না। এখনই যা হয় কিছু খেতে হবে। কিন্তু কোথায় কি পাই।

দেখলাম পাকুড় গাছটিতে অনেক পাকা পাকা পাকুড় ফল ঝুলছে—পাকুড় ফল বিষাক্ত নয় নিশ্চয়। কারণ পাখীরা তা আনন্দের সঙ্গে খেয়ে থাকে। আমি আর ধৈর্য্য ধরতে পারলাম না। নিজেকে বন্ধন মুক্ত করে ধীরে ধীরে উঠে পাকুড় ফল পেড়ে খেতে লাগলাম।

পুরো দুদিনের ওপর গাছটিতে বাসা নিযেছি। কিন্তু তার সব দিকটায় লক্ষ্য করবার অবসর পাই নি। কেবল বাঘের দিকে চেয়ে চেয়েই সময় কাটিয়েছি। আজ পাকা পাকা পাকুড় ফলের লোভে গাছের সব দিকটায় চোখ ফেলতে তার একধারে দুই তিনটে ডালের উপর একটা মাচা দেখতে পেলাম।

কিসের এ মাচ ? তবে কি কিছুদিন আগে এখানে মানুষের সমাগম হয়েছিল ? কৌতূহল পরবশ হয়ে গাছের সেই দিকটায় গেলাম। বাঘের ভয় তখন বিশেষ নেই। তার সঙ্গে দু'রাত বাস করে তাদের দৌড় অনেকটা বুঝে নিয়েছি। যতক্ষণ আমি গাছের উপর, ততক্ষণ তাদের ভয় আমার নেই। সাবধানে ডাল ধরে ধরে মাচার কাছে হাজির হলাম।

মাচার দিকে চাইতেই আমার প্রাণ যেন আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। এ কি আশ্চর্য্য ! মাচার উপর একটা রাইফেল আর তার পাশে একটা ছোট চামড়ার বাক্স। নিশ্চয় এটাতে টোটা আছে। তাড়াতাড়ি মাচায় উঠে রাইফেলটা হাতে তুলে নিলাম। দেখলাম তাতে টোটা ভরা আছে। চামড়ার বাক্সটি খুলে দেখলাম তাতে একটি ছোট টর্চ্চ লাইট আর অনেকগুলি টোটা রয়েছে। মহা আনন্দে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

তোমরা হয়তো ভাববে যে বাহাদুরী নেবার জন্যে তোমাদের কাছে একটা গাঁজাখুরী গল্প বানিয়ে বলছি। কিন্তু এটা নিছক সত্য কথা।

তোমাদের মত আমারও মনে প্রশ্ন উঠেছিল যে তেমন সময়ে সেই স্থানে একটা মাচার অস্তিত্ব কেমন করে এল, আর তার উপর টোটা আর রাইফেল কেমন করে পাওয়া সম্ভব হলো। প্রথমে আমিও ভেবে কিছু ঠিক করতে পারিনি। মনে হলো যে অসম্ভবই বা কিসে? নিশ্চয় কোন শিকারী পায়ে হেঁটে বাঘ মারা নিরাপদ্ নয় জেনে, গাছের উপর ওই মাচা বেঁধে নিয়েছিল। তারপর রাইফেল আর টোটা নিয়ে ওই মাচার উপরে সে বাঘের প্রতীক্ষায় বসেছিল। হয়তো বা বাঘগুলিকে তার বন্দুকের পাল্লার মধ্যে নিয়ে আসবার উদ্দেশ্যে সে নীচে কোথাও একটা ছাগল বেঁধে রেখে দিয়েছিল। না হয় সে কোন কারণে নীচে নামতেই হঠাৎ কোন বাঘ তাকে আমার মত করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এই রাইফেল আর টোটা সেই হতভাগ্যের।

যা হোক রাইফেলটা পেয়ে মনে ভারী উৎসাহ এসে গেল। আর আমাকে মারে কে? এইবার বাঘের দফা শেষ করে তবে আমার কাজ।

রাইফেলটা তুলে নিয়ে তাতে টোটা ভরলুম। তারপর বেশ করে বাঘটার মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলুম। বাঘটা এক গুলিতেই মরে গেল।

আমি আর বিলম্ব করতে পারলাম না। কিছুক্ষণ আগে পূর্ব্ব দিকে

রাইফেলের আওয়াজ শুনেছি। আমার দলবল সেইদিকে আধ মাইলের মধ্যে আছে নিশ্চয়।

এ সুযোগ কি হারাতে আছে? তাড়াতাড়ি জামাজোড়া গায়ে দিয়ে, রাইফেলে টোটা ভরে নিয়ে গাছ হতে নেমে পড়লাম। চামড়ার ছোট বাক্সটি কোমরে বেশ করে বেঁধে পূর্ব্বদিক লক্ষ্য করে ছুটলাম।

আমি তখন মরিয়া। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে আমার মৃত্যু নেই! তেমন অবস্থার মধ্যে পড়েও যে বেঁচে উঠতে পারে, তার মৃত্যুর বিলম্ব আছে নিশ্চয়। অন্ততঃ সেদিন আমার মৃত্যু কিছুতেই নেই।

বন-বাদাড় ভেঙে ছুটছি হঠাৎ নিকটেই বাঘের গজরানি শোনা গেল। রাইফেলটা বাগিয়ে ধরে একটা বড় গাছের ওপাশে দৃষ্টি ফেলতেই দেখলাম, সর্ব্বনাশ! একজন সাহেব মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে একটা বাঘের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছেন। বাঘটা সাহেবের বুকের উপর চেপে বসেছে বটে কিন্তু কিছুতেই তাঁকে কাবু করতে পারছে না। সাহেবটি দুই হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে বাঘের টুঁটি চেপে ধরে তার মুখখানাকে নিজের দেহ হতে তফাতে রেখে দিয়েছেন আর সঙ্গে সঙ্গে দুই পায়ের বুটজুতো দিয়ে বাঘের পেটে গুঁতো মারছেন।

বুঝলাম এ ভাবে বাঘের সঙ্গে সাহেব বেশীক্ষণ লড়তে পারবেন না। শীঘ্রই বাঘের হাতে তাঁকে প্রাণ দিতে হবে। ভাল করে দেখলাম সাহেবটি অন্য কেউ নন। আমাদের ফরেস্টারদ্বয়ের একজন।

এখনি গুলি করার প্রয়োজন। নইলে সাহেবকে জীবন্ত ফিরে পাওয়া যাবে না। কিন্তু সে রকম অবস্থায় গুলি করা বিপজ্জনক। গুলি বাঘের পরিবর্ত্তে সাহেবের গায়েও বিঁধতে পারে। কিংবা গুলি লাগার সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা এক শেষ থাবায় সাহেবের দেহটাকে মাংসের তাল বানিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু যাই হোক, দেরী আর করা চলে না। আমি রাইফেলটা বাঘের দিকে ফিরিয়ে ধরে প্রাণ-পণে চীৎকার করলাম। আমার চীৎকার শুনে বাঘটা আমার দিকে ফিরে চাইতেই তার কর্ণমূল লক্ষ্য করে গুলি করলাম। একেবারে অব্যর্থ সন্ধান। বাঘটা কাঠপানা হয়ে সাহেবের পাশে ঢলে পড়লো। .

ছুটে গিয়ে দেখলাম সাহেব খুবই আহত হয়েছেন। তাঁর আর ওঠবার সামর্থ্য নেই। আমি তাঁকে ধরে দাঁড় করাবার চেষ্টা করছি, এমন সময় আমাদের দলবল সেখানে এসে হাজির। আমাকে দেখে তাঁরা সকলে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। আমি সত্যই আমি, কি আমার প্রেতাত্মা এই সন্দেহই যেন তাঁদের চোখের দৃষ্টিতে প্রকাশ পেতে লাগলো। তারপর যখন তারা ভাবলেন যে আমিই সাহেবের রক্ষাকর্ত্তা তখন তাঁরা মহা সমাদরে আমাকে শেকহ্যাণ্ড করলেন।

তারপর আহত সাহেবকে তুলে আর বাঘটিকে বাঁশে বেঁধে নিয়ে আমরা নিজেদের বোটে ফিরে এলাম।

আমার গত দুই দিনের সব বৃত্তান্ত শুনে সকলেই খুব আশ্চয্য হয়ে গেলেন। এমন দশায়খুব কম লোকেই পড়ে।

পরদিন ভোরেই ফরেষ্টারদের বোট্ কল্‌কাতায় যাত্রা করলে। সাহেবের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁর রীতিমত চিকিৎসার প্রয়োজন। আমাদেরও সুন্দরবনের শিকার শেষ হয়ে গেল। সেইদিনই আমরা হাসনাবাদে ফিরে এলাম। পাঁচদিন বসিরহাটের ডাক-বাঙলোয় বিশ্রাম করে আসামের দিকে রওনা হলাম।

তৃতীয় পর্ব

—আসামে—

শিয়ালদা হতে রেলে যাত্রা করে প্রত্যূষেই আমরা গোয়ালন্দ ঘাটে পৌঁছুলাম। তারপর স্টীমার।

পদ্মার বুক চিরে আমাদের স্টীমার চাঁদপুরের দিকে চললো। কি ভীষণ চওড়া এই পদ্মা নদী। চারিধারেই সমান। স্টীমার হতে বহুদূরের তীর ধোঁয়ার মত বোধ হতে লাগলো।

বেলা এগারটার পর আমরা চাঁদপুরে পৌঁছুলাম। আসাম বেঙ্গল রেলের উপর চাঁদপুর স্টেশন। আমরা যাবার পনের মিনিট পরেই চাটগাঁর দিক হতে ট্রেন এল। সেই ট্রেনে আমরা আসামের দিকে রওনা হলাম। সারা দিন রাত ট্রেনেই থাকতে হলো। পরদিন একটা স্টেশনে গাড়ী বদলে বেলা একটার সময় আমরা শিলচরে পৌঁছুলাম।

শিলচর কাছাড়ের সেরা নগর। সেটি ফরেস্ট বিভাগের হেড্-

কোয়ার্টার। সেখানকার ফরেস্টার সাহেব আমার সাহেবের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমরা সদলবলে তাঁর বাঙলোয় গিয়ে উঠলাম।

সেখানে প্রায় কুড়িদিন আমাদের বিশ্রাম করতে কেটে গেল। সাহেব তাঁর বন্ধুর বাঙলোতেই থাকলেন। আমরা রইলাম একটা তাঁবুতে।

সুন্দরবনের মত আসামের জঙ্গলে পায়ে হেঁটে শিকার করা বড় সুবিধাজনক নয়। আসামের জঙ্গল খুব গভীর আর সেখানকার ভূমি মোটেই সমতল নয়।

আসামের জঙ্গলে বিস্তর বুনো হাতী আছে। সেই জন্যে হাতীর পিঠে চড়ে সেখানে শিকার করার রীতি। এই অঞ্চলে অনেক জমিদারের পোষা হাতী আছে। কিন্তু সেগুলো প্রায়ই ছাড়া থাকে আর ইচ্ছামত দূরে দূরে খেয়ে বেড়ায়। প্রয়োজন হলে খোঁজ খোঁজ পড়ে যায়। মাহুতেরা কয়েক দিন খোঁজার পর তবে তাদের ধরে আনতে পারে।

শিলচরের ফরেস্টার সাহেব দু'জন জমিদারকে হাতী পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু খোঁজ করে হাতী ধরে এনে পাঠাতে তারা বিলম্ব করে ফেললেন। কাজেই আমাদেরও শিকার যাত্রার বিলম্ব হয়ে গেল।

কয়েকদিন বাদে একসঙ্গে চারটি হাতী এসে হাজির। পরের দিনই রীতিমত রসদ, সাজ-সরঞ্জাম আর লোকজন নিয়ে আমরা উত্তর দিকে হিমালয়ের অভিমুখে যাত্রা করলাম।

চারটি হাতীর একটিতে আমার সাহেব, একটিতে তাঁর ফরেস্টার বন্ধু, আর একটিতে আমি। চতুর্থ হাতীর পিঠে কয়েক দিনের উপযোগী

সকলের আহার্য্য ও নানা সাজসরঞ্জাম বোঝাই দেওয়া হল। আমরা চললাম হাতীর পিঠে, আর আমাদের লোকজন চললো পায়দলে।

একটি পুরো দিন পথেই কেটে গেল। সে কি সোজা পথ? পথের যেন আর শেষ নেই! সারাদিন পরে সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে একটা হাতী ধরা খেদায় গিয়ে আমরা সে রাতের মত আশ্রয় নিলাম।

পরের দিন ভোরে আবার যাত্রা সুরু হলো। বেলা নয়টার সময় একটা গভীর জঙ্গলে ঢোকা গেল।

কি ভয়ানক জঙ্গল! যেমন বহুকালের পুরাণো প্রকাণ্ড গাছ, তেমনি আবার ঘন লতাগুল্ম।

জঙ্গলে নানা রকমের গাছ। তার মধ্যে শাল আর সেগুনের সংখ্যাই বেশী।

সে দিন শিকার আরম্ভ না করে লোকজনের সাহায্যে বড় বড় গাছের উপর আমাদের আশ্রয়ের জন্যে মাচা বেঁধে নেওয়া হলো।

মাচা বাঁধবার মুখেই এক মহা বিপদ। চারজন কুলি একটা গাছের উঁচু ডালে মাচা বাধছে। গাছের উপর ঠকাঠক্ শব্দ হচ্ছে। এমন সময় দুটো প্রকাণ্ড ভল্লুক বন থেকে বেরিয়ে সেই দিকে ছুটে এল। সুমুখে অনেক লোকজন আর হাতী দেখে তারা তর্‌তর্ করে সেই গাছটিতে উঠে দুজন কুলিকে জড়িয়ে ধরে তাদের টুঁটি কামড়ে ধরলে। অপর দুজন গাছের ডালে বসে থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগলো।

আমরা তখন শিকারের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। তাড়াতাড়ি



এক রকম অদ্ভুত বানর। ওরাংওটান। এদের শুধু বোর্নিও দ্বীপেই দেখা।

বন্দুক নিয়ে গাছটার কাছে যেতে যেতেই তারা লোক দুটোকে একেবারে ফেঁড়ে ফেললে। পরক্ষণেই একসঙ্গে তিনটে রাইফেল গর্জ্জন করে উঠলো আর দুজন হতভাগ্য কুলির সঙ্গে ভল্লুক দুটোও রক্তাক্ত দেহে গাছের উপর হতে ধপ্ করে মাটিতে এসে পড়লো।

কি ভয়ানক কাণ্ড! কি ভয়ানক হিংস্র জন্তুগুলো। এত লোক-জন, হাতী, তবু ভয়ের নামটি নেই। মানুষ দেখলেই এদের জিঘাংসা একেবারে প্রবল হয়ে ওঠে।

মাচা তৈরি শেষ হয়ে গেলে আমরা মাচাতেই আশ্রয় নিলুম। খাওয়া দাওয়া সব মাচার উপরেই হতে লাগলো। নীচে চারটে হাতী আর কুলিরা মিলে আমাদের গাছগুলো ঘিরে রইলো। শুকনো পাতা, রাশি রাশি কাঠ যোগাড় করে নিয়ে তারা তাদের চারধারে আগুন জ্বেলে দিলে। সেই আগুনের বেড়াজালের মধ্যে সারারাত জেগে আমরা নানা জন্তু জানোয়ারের ডাক শুনতে লাগলুম।

পরদিন বেলা সাতটার মধ্যে আহারাদি সেরে নিয়ে হাতীর পিঠে ওঠা গেল। কুলিরা নানা অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আমাদের সঙ্গে চললো। মাচা পাহারা দেবার জন্য একটা লোকও সেখানে থাকতে রাজী হলো না। অগত্যা আমাদের আশ্রয় অরক্ষিত রেখেই যাত্রা করতে হলো।

বহুক্ষণ ঘুরে আমরা একটি শিকারও হস্তগত করতে পারলাম না। তখন আমার সাহেবের পরামর্শে আমরা তিনজন তিন দিকে ছড়িয়ে পড়লাম। সঙ্গের লোকগুলো তিন ভাগ হয়ে আমাদের সঙ্গ নিলে।

আমি চললাম পূব দিকটায়। সে দিকের জঙ্গলটা কিছু পাতলা ছিল। সে দিকের অনেকগুলো বড় বড় শাল ও সেগুন গাছ কাটা ছিল। বড় গাছ পাতলা থাকলেও ঘন লতাগুল্মের অভাব ছিল না।

হাতী না থাকলে বোধ হয় পায়ে হেঁটে সে ঘন জঙ্গলের ভিতর ঢোকা সম্ভব হতো না। ঝোপ জঙ্গল পায়ে দলে, শুঁড় দিয়ে গাছের ডাল-পালা ভেঙে পথ করে হাতীটা এগিয়ে চলেছে। আমার সঙ্গী কুলিরা কুড়ুল টাঙি, রামদার সাহায্যে পথ করে নিয়ে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে, এমন সময় হাতীর পায়ের কাছ হতেই একটা বাঘ ছিটকে বেরিয়ে কুলিদের মধ্যে লাফিয়ে পড়লো। চলন্ত হাতীর পিঠ থেকে তাড়া-তাড়ি গুলি করবার সুযোগ পেলাম না। ভাবলুম দু-একটা কুলির আয়ু বুঝি শেষ হলো।

কিন্তু আশ্চর্য্য দেখলাম আসামী কুলিদের ক্ষিপ্রকারিতা। তারা নিমেষে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে দু'তিন দিক হতে তার দিকে বল্লম ছুঁড়ে মারলে। তাদের লক্ষ্যও অসাধারণ। একবার দুটি বল্লম দু'দিক থেকে তাকে বিঁধে ফেললে। বাঘটা তবুও গর্জ্জন করতে করতে তাদের ধাওয়া করতে গেল। কিন্তু আর একটা আসামীর ধারাল টাঙির একঘা মাথায় পড়তেই সে দাঁত বার করে বনের মধ্যে চিৎ হয়ে পড়লো।

ঘণ্টাখানিক যাবৎ কোন জানোয়ার সুমুখে পড়লো না। তবে মাঝে মাঝে তাদের ভীষণ গর্জ্জন শুনতে লাগলাম। একটু পরেই সুমুখে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড বাঘ। আমার হাতীর দশ হাত আগে সেটা মাটিতে থাবা গেড়ে বিকট গর্জ্জন আরম্ভ করলে। বুঝলাম সেটা একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এত কাছে আর ঠিক সুমুখে বলে গুলি করবার সুযোগ পেলাম না।

রাইফেল তুলেই দেখি সুমুখে মাহুতের মাথা। শেষে কি বাঘ মারতে গিয়ে মাহুতের মাথাটাই উড়িয়ে দেব? তাড়াতাড়ি রাইফেল

নামিয়ে নিলাম। ঠিক সেই অবসরে ভয়ানক একটা গর্জ্জন করে বাঘটা লাফ দিয়ে হাতীর মাথায় উঠতে গেল। ভাবলাম সর্ব্বনাশ! হাতীটাকেই বুঝি সাবাড় করে। কিন্তু হাতীটাও খুব শিকারী। সে শুঁড় বাড়িয়ে উপর থেকেই বাঘটাকে ধরে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে এক আছাড়। বাঘটা ওঠবার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই হাতী তার উপরে একশো মণ ওজনের পা-খানি চাপিয়ে দিতেই সে একেবারে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেল।

তখন বেলা তিনটে। শীতকালের দিন। সাড়ে পাঁচটাতেই সন্ধ্যে হয়ে পড়বে। আমরা এসে পড়েছিও অনেক দূর। এতখানি পথ আবার ফিরে যেতে হবে। অগত্যা সে দিনের মত শিকার শেষ করে আমরা ফিরে আসতে লাগলাম। ফেরবার পথে দু তিনটে বাঘ আর ভল্লুক চোখে পড়লো। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে বলে সেগুলোকে রেহাই দিয়ে আমরা বেলা পাঁচটার সময় আমাদের আশ্রয়ে ফিরে এলাম।

ফরেস্টার সাহেব আমার একটু আগেই ফিরেছিলেন। তিনিও দুটো ভল্লুক আর একটা বাঘ মেরে এনেছেন দেখলাম। শুনলাম তিনি একটা গণ্ডারের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা এমন দৌড় দিলে যে তাকে আর তিনি খুঁজেই পেলেন না।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা এসে গেল। আমার সাহেব তখনও ফিরলেন না দেখে আমরা ভারী বিব্রত হয়ে পড়লাম। আমাদের যে রকম বন্দোবস্ত ছিল তাতে সাড়ে পাঁচটার পূর্ব্বেই সকলের ফিরে আসার কথা। কিন্তু পৌনে ছটা হয়ে গেল তবু তাঁর দেখা নেই। তার সঙ্গের কুলিদেরও সাড়া পাওয়া গেল না।

আমরা ভারী উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলাম। ভাবলাম, তবে কি সাহেব বিপদগ্রস্ত হয়েছেন? কিন্তু তা হলেও তো সঙ্গের কুলিরা ফিরে আসবে। আর হাতী? সেটাই বা যাবে কোথায়?

হঠাৎ দূরে মশালের আলো আর কোলাহল শুনতে পেলাম। সকলেরই মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠলো। তা হলে সাহেব ফিরছেন।

কিন্তু কুলিরা ফিরে এল বিষণ্ণ মুখে দুটো বাঘ আর একটা ভল্লুক নিয়ে। সাহেবও নেই, তাঁর হাতীও নেই। কেবল মাহুতের ছিন্ন ভিন্ন মৃতদেহটা তারা কাঁধে করে ফিরিয়ে এনেছে। বুঝলাম ব্যাপার খুবই সাংঘাতিক।

কুলিরা বললে সাহেব বেশ আরামে শিকার করছিলেন। প্রথমেই তিনি দুটো বাঘ মারেন। তারপর তিনি একটা বুনো শুয়োরের পিছনে তাড়া করেন।

যাবার পথে একটা প্রকাণ্ড ভল্লুক গাছের ডালে পাতার ভিতর লুকিয়ে বসেছিল। সাহেব নিজে, বা দলের কেউই তাকে দেখতে পায়নি।

সাহেবের হাতী গাছের তলা দিয়ে যাবার সময় ভল্লুকটা গাছ হতে লাফ দিয়ে হাতীর কাঁধের উপর পড়ে আর মাহুতটাকে জড়িয়ে ধরে তাকে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে। হাতীটাও হঠাৎ ভয় পেয়ে ক্ষেপে উঠে সাহেবকে নিয়ে বন জঙ্গল ভেঙে ছুটতে থাকে।

সাহেব খুব তাড়াতাড়ি গুলি চালিয়েছিলেন। তার ফলে ভল্লুকটা মাহুতকে জড়িয়ে নিয়ে নীচে পড়ে যায়। কুলিরা দৌড়ে কাছে গিয়ে মাহুতকে মরা দেখতে পায়।

প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়ে তারা বহুদূর পর্য্যন্ত সাহেব আর হাতীর

খোঁজ করে বেড়িয়েছে, কিন্তু কোথাও তাদের দেখতে পায় নি। শেষে সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে তারা অনুসন্ধান ছেড়ে, মশাল জ্বেলে অতি কষ্টে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে।

কুলিদের কথা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসলাম। কী সর্ব্বনাশ! তা হলে তো সাহেবের বড় বিপদ! তিনি এতক্ষণ বেঁচে আছেন কি না তাই সন্দেহ। এই ভীষণ জঙ্গল, তার উপর রাত্রিকাল। কোথায় তিনি আশ্রয় পাবেন? ক্ষ্যাপা হাতী তাঁকে কোথায় নিয়ে গিয়ে হাজির হবে তাই বা কে বলতে পারে? মাহুত নেই। সে আর পথ, অপথ মানবে না—যে দিকে খুসী সেই দিকে ছুটবে। তারপর গাছ, পালা, বন, জঙ্গলের ধাক্কা লেগে যদি তিনি হাতীর পিঠ হতে পড়ে যান, তাহলে হয় হাতীটা নিজেই তাঁকে মেরে ফেলবে, না হয় হিংস্র জানোয়ারদের হাতে তাঁর প্রাণ যাবে।

আসামের জঙ্গল। তায় অন্ধকার রাত। এ সময়ে কারও খোঁজে বার হওয়া মানুষের অসাধ্য। তাহলে উপায়?

ফরেস্টার সাহেব বল্‌লেন, তিনি আর বেঁচে নেই এ কথা ধ্রুব সত্য। এমন কি তাঁর দেহের শেষ টুক্‌রোটি পর্য্যন্ত নিশ্চয় এতক্ষণ হিংস্র পশুদের উদরস্থ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু তবু একবার খোঁজ নিয়ে দেখা উচিত। কি জানি যদি তিনি কোথাও আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকেন?

কথাবার্ত্তার পর সব ঠিক হল যে—কাল ভোর হতে প্রাণপণে চেষ্টা করা যাবে। তাতে যদি আমাদের প্রাণও যায় ক্ষতি নেই।

তারপর যে যার খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লো। একদল পালাক্রমে পাহারা দেবার জন্যে জেগে বসে রইলো।

ফরেস্টার সাহেব বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগলেন। কিন্তু আমার চোখে আর ঘুম এলো না। সাহেবের জন্যে আমার মন বড়ই অস্থির হয়ে পড়লো। সে রাত্রে আমি আর কিছু খেলাম না। মাচার উপর শুয়ে কেবল সাহেবের কথাই ভাবতে লাগলাম।

খুব ভোরে উঠেই রীতিমত গোছ-গাছ করে নিয়ে সকলে এক সঙ্গে সাহেবের খোঁজে বেরুলাম।

যেখানে ভল্লুকটা মাহুতকে আক্রমণ করেছিল, আমার সাহেবের কুলিরা আমাদের সেই দিকেই নিয়ে চললো।

দু ঘণ্টার মধ্যে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছলাম। তারপর যে পথে হাতীটা সাহেবকে নিয়ে ছুটে ছিল সেই পথে আমরা সদলবলে এগুতে লাগলাম। কিন্তু হাতীর পথের সন্ধান কিছুতেই করতে পারলাম না।

তখন বুঝলাম বিষম সমস্যা। এরকম ভাবে একদিকেই যদি সকলে যাওয়া যায় তা হলে সাহেবের সন্ধান পাওয়া অনিশ্চিত।

ফরেস্টার সাহেবের সঙ্গে দুটো হাতী আর অধিকাংশ কুলিদের পাঠিয়ে দিয়ে আমি মাত্র দশজন অনুচরের সঙ্গে অপর দিকে চললাম।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিশেষ বিপদের মুখ দেখতে হয় নি। কিন্তু তার পরেই একটা অঘটন ঘটে গেল।

আমাদের যাবার পথে একটা প্রকাণ্ড গণ্ডার গাছের গুঁড়িতে তার শিঙটা ঘষছিলো। সাড়া পেয়েই সে একটা বিকট আওয়াজ করে আমাদের তাড়া করলে। সুমুখে ছিল কুলির দল। গণ্ডারটা একেবারে দলের মধ্যে ঢুকে দুটো লোককে ফেড়ে ফেললে। তখন তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারলে, পালাতে লাগলো। আমি পর পর দুটো গুলি চালালাম। কিন্তু তাতে সে ভ্রূক্ষেপও করলে না। শেষে আমার হাতীর দিকে সে তেড়ে আসতে লাগলো।

হাতীটা গণ্ডারের উগ্রভাব দেখে, বন-জঙ্গল ভেঙে একদিকে ছুটতে লাগলো। মাহুতের তাড়না, অঙ্কুশ কিছুই সে আর গ্রাহ্য করলে না। প্রাণপণ শক্তিতে মাহুত আর আমাকে নিয়ে ছুটতে আরম্ভ করলে।

মাহুত প্রাণপণে হাতীটাকে থামাবার চেষ্টা করতে লাগলো. তার নানা রকম চালনা কৌশল, তার অঙ্কুশের ঘন ঘন আঘাত, সে সব অবজ্ঞা করে তীরবেগে একদিকে ছুটতে লাগলো।

দেখতে দেখতে একটা গাছের মোটা শাখায় ধাক্কা খেয়ে মাহুত ছিটকে হাতীর পিঠ থেকে নীচে পড়ে গেল। তাকে সেই অবস্থায় ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে বাঘ ভল্লুকের মুখে ফেলে রেখে, হাতী আমাকে নিয়ে ছুটল।

কিছুক্ষণ পরে একটা সঙ্কীর্ণ নদীর ধারে এসে পড়লাম। ওই জঙ্গলের মধ্যেই সে নদী। তাকে ঠিক নদী বলাও চলে না। একট প্রাকৃতিক সরু খাল মাত্র। পাহাড় থেকে ঝরণার জল ওই খাল দিয়ে বোধ হয় কোন নদীতে গিয়ে পড়ছে। খালের দুই পাশে কেবল পাথরের রাজত্ব।

হাতীটা আমাকে নিয়ে সেই খালের জলে নেমে পড়লো। খালটি যদিও বেশী চওড়া নয়, তবু সেটি বেশ গভীর। একটুখানি যেতেই হাতীর পিঠ ডুবে গেল! আমার শরীরেও জল স্পর্শ করলে।

আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না পেয়ে আমি হাতীর পিঠ থেকে জলে নেমে পড়লাম। তারপর সাঁতরে তীরে এসে উঠলাম।

তীরে এসে প্রাণপণে ছুটতে লাগলাম। আমার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষার জন্যে একটা উপযুক্ত আশ্রয় খুঁজে নেওয়া।

একটুখানি যেতেই একটা প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ চোখে পড়লো। ঠিক যেন একটি ছোট পাহাড়। স্তূপটিতে মাটির সংস্পর্শ নেই। কেবল অনেকগুলো বড় বড় কালো পাথর কে যেন সীমেণ্ট দিয়ে একসঙ্গে এঁটে রেখে দিয়েছে।

একটু কাছ বরাবর যেতেই দেখলাম স্তূপটির সুমুখে একটা ভল্লুক মরে পড়ে রয়েছে। তার শরীরের দু-তিন স্থান হতে রক্ত বেরিয়ে সেখানকার পাথরের উপর জমে কালো হযে আছে।

আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। এখানে ভল্লুক মারলে কে? দেখলাম তার শরীরে দু-তিনটে গুলির আঘাত। তাহলে ভল্লুকটাকে গুলি করেছে কেউ নিশ্চয়। কিন্তু কে সে? এখানে কেমন করে এল?

সন্দিগ্ধভাবে চারিদিকে ভালো করে চাইতেই দেখলাম স্তূপটির সুমুখে দুচার খণ্ড পোড়া কাঠ আর একরাশ ছাই। তার পাশেই স্তূপের গা ঘেঁসে কতকগুলি বড় বড় পাথর ওপর ওপর এমন ভাবে সাজানো যা দেখলেই বোঝা যায় যে কোন লোক সেগুলিকে সাজিয়ে রেখে দিয়েছে।

অবাক্ হযে সেই দিকে চেয়ে আছি—হঠাৎ ভিতর থেকে ধাক্কা দিয়ে কে যেন সেই পাথরগুলো ধসিয়ে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম—Hallo Jhantu! I'm glad to see you. But how you come here?

কথা বলতে বলতেই ভিতর হতে গুঁড়ি মেরে সাহেব বেরিয়ে এলেন। আমি অবাক্ হয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইলাম।

সাহেব বললেন—"আমি জানি তোমরা আমাকে খুঁজতে বেরুবে। কিন্তু এরকম দুর্গম স্থানে তোমরা যে আমাকে খুঁজে বার

করবে এ আশা মোটেই করিনি। যাহোক তোমাকে দেখে ভারী খুসী হয়েছি। কিন্তু এস্থান নিরাপদ্ নয়। ভিতরে এসো, সব কথা বলছি।"

সাহেবের পেছন পেছন গুঁড়ি মেরে গুহাটার মধ্যে ঢুকলাম। গুহাটি চওড়ায় দুহাত আর লম্বায় প্রায় দশ হাত হবে। তার ভিতরে দাঁড়াবার উপায় না থাকলেও বেশ স্বচ্ছন্দে বসে থাকা যায়।

বুঝলাম এই নির্জ্জন দুর্গম স্থানে এই রকমের একটি গুহা পেয়েছিলেন বলেই সাহেব এতক্ষণ পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন।

সাহেব বললেন, "কুলিদের কাছে আমার দুর্ঘটনার কথা শুনেছ বোধ হয়! মাহুত মরবার পর হাতীটা আমাকে নিয়ে যে রকম ভাবে ছুটলো, তাতে বুঝলাম যে আমারও আর রক্ষা নেই। অনেক কষ্টে বন, জঙ্গল, ডাল, পালা থেকে নিজেকে বাঁচাতে লাগলুম। হাতীর পিঠে থাকলে মরণ অবশ্যম্ভাবী জেনে কোন রকমে নামবার উপায় খুঁজতে লাগলুম। কিন্তু মিনিট কুড়ির মধ্যে কোন উপায় দেখতে পেলাম না। শেষে আমার মাথার দুহাত উপরে একটা গাছের মোটা ডাল দেখতে পেলাম। হাতীটা তার তলা দিয়ে যাবার সময় আমি উঠে দাঁড়িয়ে টপ্ করে সেই ডালটা দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ঝুলে পড়লাম। হাতীটা নিজের গোঁভরে চলে গেলে, আমি লাফ দিয়ে নীচে পড়লাম।

আশ্রয়ের জন্যে চারদিকে চেয়ে ছুটতে ছুটতে এই গুহাটা দেখতে পেলাম। কিন্তু এর ভিতর থেকে একটা উগ্র গন্ধ বেরুতে দেখে বুঝলাম এটি একটি জানোয়ারের বাসস্থান। পকেটে টর্চ্চলাইট ছিল। তার সাহায্যে ভিতরটা দেখে বুঝলাম উপস্থিত কোন জন্তু

এর মধ্যে নেই। আমি আর কালবিলম্ব না করে এর মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

একটু পরেই দেখলাম একটা প্রকাণ্ড ভল্লুক গুহার সুমুখে হাজির। বুঝলাম এটা তারই আড্ডা। ভিতর থেকে গুলি চালালাম! পর পর তিনটে গুলি মারতে সেটা মলো।

নিজেকে সুরক্ষিত করবার জন্যে গুহার বাইরে গেলাম। খালের ধারে কতকগুলি বড় বড় পাথরের চাঁই রয়েছে দেখে এক এক করে এই কটা পাথর বয়ে আনলাম। স্তূপটার পাশে কতকগুলি গছের গুঁড়ি, ডাল, পাতা কাটা পড়ে ছিল। তারই গোটাকতক বয়ে এনে গুহাটার সুমুখে কাঁড়ি করলাম।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। আমি কাঠের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গুহার মধ্যে বসে রইলাম। সারারাত জেগে কাটিয়েছি। রাত্রে অনেকগুলো জানোয়ার আশপাশে হাম্‌লে বেড়িয়েছে। কিন্তু আগুন দেখে কেউ কাছে আসতে সাহস করেনি। সকালের দিকটায় একটু ঘুমিয়েছি। ঘুম ভাঙতেই তোমাকে দেখতে পেলাম।”

চুপ করে সাহেবের কথাগুলো শুনে বুঝলাম রাখে হরি মারে কে! আমার কথাও সাহেবকে বললাম। সাহেব তা শুনে আশ্চয্য হয়ে গেলেন।

তারপর উদ্ধারের চেষ্টায় দুজনে গুহার বাইরে গিয়ে স্তূপের পাশ হতে কতকগুলো মোটা মোটা ডাল, আর একটা গাছ থেকে গোটাকতক লতা টেনে এনে,—লতা, আর শুকনো ডালের সাহায্যে দুটি ছোট ভেলা তৈরী করলাম। তারপর দুজনে পালাক্রমে জাগতে জাগতে গুহার মধ্যে রাতটা কাটিয়ে দিলাম।

ভোরে উঠেই দুজন দুখানি ভেলায় উঠে বসলাম। নদীতে খুব টান। দাঁড় বাইতে হলো না। জলের টানে ভেলা দুটি রীতিমত বেগে চললো।

একঘণ্টা পরে আমরা জঙ্গলের সীমানা পেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় পড়লাম। খালের দুধারে ফাঁকা মাঠ আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট জঙ্গল। আরও পাঁচ ছ ঘণ্টা পরে আমরা ভেলা ছেড়ে কূলে নেমে মাঠ পার হয়ে একটুখানি যেতেই দেখলাম একটা হাতী ধরা খেদা।

খেদা হতে দু'টি ঘোড়া ভাড়া করে নিয়ে শিলচরের দিকে যাত্রা করলাম।

শিলচরে দুই সপ্তাহ-বিশ্রাম করা হল। তারপর আমরা কলকাতায় এলাম। সেখানে থাকলাম পাঁচ দিন। কলিকাতা হতে বম্বে। বম্বে থেকে একখানা বড় জাহাজে আমরা আফ্রিকা যাত্রা করলাম

চতুর্থ পর্ব্ব

—আফ্রিকায়—

বম্বে হতে যে জাহাজখানিতে আফ্রিকা যাত্রা করলাম, সেটি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্টিম নেভিগেশন কোম্পানীর জাহাজ। প্রতি চোদ্দ দিন অন্তর বম্বে থেকে একখানি করে জাহাজ আফ্রিকার অভিমুখে যায়। জাহাজে যে নক্সা আছে তা দেখে বুঝলাম জাহাজখানি বম্বে থেকে একদমে সিসিলিস্ দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে থামবে। তারপর পূর্ব্ব আফ্রিকার মোম্বাসা বন্দরে গিয়ে পৌঁছুবে।

সমুদ্র-যাত্রা তো দূরের কথা চোখেও কখনো সমুদ্র দেখিনি। সমুদ্র যে বাস্তবিক কি বিরাট বস্তু তা কখনো ধারণা করতে পারিনি। ভূগোলে সমুদ্রের পরিচয় পেয়েছি, নানা গল্পে ও কবিতায় সমুদ্রের বর্ণনা পাঠ করেছি, কিন্তু তাতে সমুদ্র সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মেছিল তার কোন মূল্যই নেই। স্বচক্ষে দেখে যা বুঝলাম, গল্প শুনে বা বর্ণনা পড়ে তার দশ ভাগের একভাগ জ্ঞানও হয়নি।

দিনের পর দিন রাতের পর রাত ধরে, সীমাহীন ধোঁয়ার রাজ্যের ভিতর দিয়ে, আমাদের প্রকাণ্ড জাহাজখানি আরব উপসাগরের বুক চিরে অবিশ্রান্ত গতিতে চলতে লাগল। সে চলার বিরাম নেই, বুঝি তার শেষও নেই।

চলেছে তো চলেছে। থামবে কবে তা যেন জানি না। বিস্মিত দৃষ্টিতে যে দিকে চাই, কেবল ধোঁয়া, আর কুয়াসা। আমাদের আশে পাশে কিছুদূর পর্য্যন্ত কেবল দেখছি একটা পাহাড়ের মত ঢেউ ধেয়ে আসছে। প্রতিক্ষণে মনে হচ্ছে ঢেউগুলি আমাদের জাহাজের উপর দিয়ে চলে যাবে, আর সেই অসীম সমুদ্রের মধ্যে ছোট মোচার খোলার মত জাহাজটি বুঝি কোন্ অতলতলে এক নিমেষে তলিয়ে যাবে। কিন্তু জাহাজের কাছে এসে ঢেউগুলো তলা দিয়েই চলে যায়, আর জাহাজখানি তোলপাড় খেতে থাকে।

ক্রমে আরব উপসাগর পেরিয়ে ভারত মহাসাগরে এসে পড়লাম। দিক্-নির্ণয় যন্ত্র দেখে বুঝলাম আমরা বম্বে থেকে কেবলই দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চলেছি। আমাদের জন্যে জাহাজের দোতলায় একটি কেবিন নির্দ্দিষ্ট ছিল। কিন্তু ঘুমোবার সময়টি ছাড়া আমি সকল সময়ে ডেকের উপরেই বসে থাকতাম।

ডেকের উপর বসে, দিগন্ত বিস্তৃত ধোঁয়াচ্ছন্ন জলরাশির দিকে চেয়ে চেয়ে কত কথাই আমার মনে আসতো। মনে হতো কোথাকার কে আমি, আর কোথায় বা চলেছি। কোথায় বঙ্গদেশের এক নিভৃত পল্লী, আর কোথায় এই ভারত মহাসাগর। তারপর কোথায় বা সেই অপরিচিত আফ্রিকা।

ভাবতুম, আর প্রাণে একটা মহা গৌরব অনুভব করতুম। ভেতো বাঙালীর ছেলে আমি। তবু আজ আমি কি দুঃসাহসিকতার কাজেই অগ্রসর হয়েছি। কুনো ব্যাংএর মত যে জাত কেবল দিনরাত ঘরের মধ্যে বদ্ধ থাকতেই জানে, নিজের বস্তুর সীমানার বাইরে যেতে হলেই যে জাত পাঁজি খুলে বসে ; বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগিনী, দিকশূল ইত্যাদির বিচার করতে করতে যারা নিজেদের প্রতি পদ-ক্ষেপেই বাধা খুঁজে বার করে, সেই জাতের ছেলে তো আমি ?

পা বাড়াতেই হাঁচি, টিকটিকির শব্দে চমকে উঠে যারা আবার পা টেনে নেয়, পাছু ডাক শুনলেই যাদের যাত্রা স্থগিত রাখতে হয়, কাকের ডাক বা শূন্য কলসী দর্শনে যাদের পা বাড়ানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, আমি তো তাদেরই বংশধর ?

বিদেশের একশো টাকার চেয়ে দেশের দশ টাকা যাদের বাঞ্ছনীয়, বিপদের আশঙ্কায় সাহেবের কাজ ছেড়ে দিয়ে, নিজেদের ঘরের মধ্যে উপবাস করে মরে থাকাও যারা শ্রেয় মনে করে, আমি তো তাদেরই একজন ? তবু আমি কি গৌরবময় জীবন বরণ করে নিয়েছি ! বাঙালী জাতের জাতিগত চির দুর্ব্বলতার পরিবর্ত্তে একি মহান্ প্রেরণা আমাকে বীর জাতের অনুসরণীয় পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে !

আবার ভাবি পৃথিবী না জানি কত বড়, কত বিরাট। তার বুকে কত সাগর, মহাসাগর—কত দেশ, মহাদেশ—কত দ্বীপ, আরো কত কি রয়েছে। তার এক একটির দৈর্ঘ্য কত, কত বিস্তার। এক ভারত মহাসাগর দেখেই আমার চক্ষু স্থির। তবু তার কতটুকুই বা দেখেছি?

আমার মনে হলো কি অসাধারণ এই পাশ্চাত্ত্য জাতি! যারা দুর্দ্দমনীয় পণ, অসীম অধ্যবসায়, আর অপ্রতিহত সাহস নিয়ে, বিপদ্, মরণ, তুচ্ছ জ্ঞান করে, মহাধর ডিঙিয়ে মহাসাগরে পাড়ি দিয়ে, দেশ, মহাদেশ পার হয়ে, সারা পৃথিবীময় তাদের বীরত্বের জয়ডঙ্কা বাজিয়ে বেড়াচ্ছে।

এমন না হলে মানুষ? আর আমরা? আমরা কি? এক গ্রাম হতে আর এক গ্রামে যেতে হলে দশবার এগুই, দশবার পেছুই। কোন কাজে সামান্য একটু বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই আমরা সে কাজ পরিত্যাগ করি। কোথাও একটু মারামারি দাঙ্গার নাম শুনলেই আমরা দোরে খিল এটে ঘরের মধ্যে বসে থাকি। শেয়াল কুকুরের ভয়, চোরের ভয়, ভূতের ভয়, ভয় আর ভয়। শিশুকাল হতে ভয়ই আমরা শিক্ষা পেয়ে আসি। কাঁদলে জুজুর ভয়, না ঘুমুলে হুমোর ভয়, বাইরে গেলে ভূতের ভয়, না পড়লে পণ্ডিতের ভয়। রোদে বেড়ালে জ্বর হবার ভয়, জলে ভিজলে সর্দ্দির ভয়, গাছে উঠলে পড়ে যাবার ভয়। ভয় পদে পদে, ভয় সব কাজে।

কাজেই সাহস বলে কোন জিনিসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় না। কিন্তু সাহসই বল, সাহসই শক্তি, সাহসই মনুষ্যত্ব প্রচারের প্রধান পন্থা। সাহস আছে বলেই পাশ্চাত্ত্য জাতি পৃথিবী জয়ী। সাহস নেই বলেই আমরা সব হারিয়ে আজ পরমুখাপেক্ষী।

আমার মনে হলো যে আমাদের এই শৈশব হতে প্রাণপাত করে

লেখাপড়া শেখা, এই সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান নিয়ে দেহের রক্ত জল করা, এ সব পণ্ডশ্রম। সাহস না থাকলে এর কোনটিরই সদ্ব্যবহার হয় না। প্রাণের ভয়কে তুচ্ছজ্ঞান করে আমর. অসীম দুঃসাহসের সঙ্গে নানা সাহসিকতার কাজ করতে না শিখলে. কোনকালেই আমাদের গতিমুক্তি হবে না।

এই রকমের নানা কথা ভাবতে ভাবতে আর অনন্ত নীল সমুদ্রের তরঙ্গলীলা দেখতে দেখতে দিনের পর দিন কাটতে লাগল। নয় দিনের দিন সিসিলিস দ্বীপপুঞ্জে আমাদের জাহাজ নোঙর করলে।

দীর্ঘ নয় দিন পরে চোখে স্থল দেখতে পেলাম। বন্দরে নানা জাতের লোক। সেখানে মাত্র একদিন বিশ্রাম করলাম। তারপর আবার জাহাজ চলতে লাগল।

এবার জাহাজের গতি বদলে গেল। বম্বে থেকে বরাবর দক্ষিণ পশ্চিমে এসেছি। এবার জাহাজ চললো ঠিক পশ্চিমে। আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। তাই পথে ঝড়, জল পাইনি। নইলে কি হতো তা কে জানে।

তিমি মাছের নাম বইতেই পড়েছি। কখনো তা চোখে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি। এবার ভারত মহাসাগরের মাঝখানে দু-তিনটে ভাসতে দেখলাম। বাপরে! কি প্রকাণ্ড দেহ! বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে এত বড় জীব থাকতে পারে তা মনেই করিনি।

আর একটা জীব দেখলাম, যার কথা মনে হলে এখনো গা শিউরে ওঠে। সে নাকি সামুদ্রিক অজগর।

তখন সিসিলিস হতে দুদিনের পথ আসা গেছে। অনুকূল বাতাসে জাহাজ বেশ স্বচ্ছন্দে ছুটেছে। আমি দোতালার ডেকে বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে আছি। হঠাৎ আমাদের জাহাজ হতে

প্রায় চার শো হাত দূরে কি একটা ভাসতে দেখা গেল। তার দেহটা জলের নীচে, কেবল পিঠের কাঁটাগুলো জলের উপর দেখা যাচ্ছে। এর যেন আর শেষ নেই। যতদূর যাই, কেবল সেই কাঁটার সারি। একটা জীব এত লম্বা হতে পারে? দু মাইলের উপর যেতে তবে সে কাঁটা শেষ হলো।

সাহেব বললেন, "এরা এক একটা দুই হতে তিন মাইল পর্য্যন্ত লম্বা হয়। মাঝে মাঝে এরা প্রকাণ্ড জাহাজের ডেকের উপর থেকে মানুষ ধরে গিলে খায়। একবার নাকি এই রকমের একটা অজগর একটা প্রকাণ্ড তিমিমাছকে জড়িয়ে ধরে সমুদ্রের জল থেকে শূন্যে তুলে ধরেছিল।

শুনে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। বাপরে! কি ভয়ানক সাপ!

সিসিলিস থেকে জাহাজ ছাড়বার পর তিন দিনের দিন পূর্ব আফ্রিকার মোম্বাসা বন্দরে পৌঁছলাম।

মোম্বাসা প্রকাণ্ড বন্দর। বহু লোকের সেখানে বাস। ইংরাজ, ফরাসী, ডচ, মার্কিন, নানা জাতের লোক ব্যবসাসূত্রে সেখানে আড্ডা গেড়েছে। কাফ্রি, নিগ্রো প্রভৃতি আফ্রিকার অধিবাসীও বিস্তর।

আমরা ইস্ট আফ্রিকান লজ নামক একটা প্রকাণ্ড ইউরোপীয় হোটেলে বাসা নিলাম। সেখানে এক সপ্তাহ বিশ্রাম করবার পর মোম্বাসা হতে রেলযোগে ভিক্টোরিয়া হ্রদের অভিমুখে যাত্রা করলাম। ভিক্টোরিয়া হ্রদ মোম্বাসার পশ্চিমে মধ্য-আফ্রিকার দিকে। মোম্বাসা হতে তার দূরত্ব ছয় শো মাইলের উপর। আমরা এক স্থানে ট্রেন থেকে নামলাম।

ভিক্টোরিয়া হ্রদ সেস্থান হতে পঞ্চাশ মাইল। সেদিকে রেল নেই। পায়ে হেঁটে কিংবা হাতীর পিঠে সেখানে যেতে হয়। আমরা সেখানে ট্রেন বদলে ভিক্টোরিয়া হ্রদের উত্তর পূব দিকে কিসুমু নামক স্থানে গেলাম। কিসুমুতে আবার রেল বদলে তিন শো মাইল দূরে ইউগ্যাণ্ডা নামক স্থানে পৌছলাম।

এই তিন শো মাইল রেলপথ বড়ই সঙ্কটপূর্ণ। কেবল পাহাড়, জঙ্গল, আর তরাই-এর মাঝ দিয়ে এই পথ। পথের দুধারে গভীর অরণ্য আর লম্বা তৃণাচ্ছাদিত উপত্যকা। তাতে কোন রকম বন্য জন্তুরই অভাব নেই।

মাঝে মাঝে রেল লাইনের উপর গণ্ডার, হাতী, জলহস্তী এসে পথ আটকে পড়ে থাকে। বাঁশী দিয়ে, বন্দুকের আওয়াজ করে তবে ট্রেন চালাতে হয়।

দেখলাম শিকারের উপযুক্ত দেশেই যাচ্ছি।

ইউগ্যাণ্ডায় বৃটিশ সেনানিবাসে আমরা আশ্রয় নিলাম। আমার সাহেব সাধারণ লোক নন। সেখানে সেনানীদের মধ্যেও তাঁর দু-তিন জন পরিচিত বন্ধু রয়েছেন দেখলাম।

প্রায় দুই সপ্তাহ আমরা সেনানিবাসে রইলাম। সেখান হতেই শিকারের সব আয়োজন ঠিক হয়ে গেল। আরও তিনজন ইংরাজ শিকারী আমাদের সঙ্গে শিকারে যেতে চাইলেন। আমাদের সঙ্গে নানা রকমের সরঞ্জাম, তাঁবু, রসদ, অস্ত্র-শস্ত্র, ডিনামাইট ইত্যাদি বিস্তর রকমের জিনিস নেওয়া হল। আফ্রিকার নিগ্রো আর কাফ্রি-জাতীয় কুলি নেওয়া হল পঞ্চাশ জন। প্রচুর খাদ্য, ঔষধ, ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদির তো কথাই নেই।

এই রকমের বিরাট আয়োজন করে আমরা চললাম শিকার করতে। ইউগ্যাণ্ডার পরেই বেলজিয়ানদের অধিকৃত কঙ্গো প্রদেশ। তার মধ্যে কঙ্গো নদীর দুই পাশেই গভীর জঙ্গল। তেমন প্রকাণ্ড জঙ্গল আশেপাশে আর কোথাও নেই। সেই জঙ্গলে সব রকমের জানোয়ার প্রচুর পাওয়া যায়। তা ছাড়া নানাজাতীয় নরখাদক বুনো মানুষও আছে। হিংস্র পশুদের চেয়ে তারা নাকি আরও ভয়ঙ্কর। পশুদের হাতে রক্ষা আছে, কিন্তু তাদের হাতে বাঁচা দুষ্কর। সাহেবরা সেই জঙ্গলই শিকার অভিযানের জন্যে মনোনীত করলেন।

বহুকষ্টে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে যে অল্প পরিসর নদার তীরে আমরা উপস্থিত হলাম, সেটি কঙ্গোরই একটি শাখা নদী। তার দুই ধারে গভীর বন আর ছোট বড় পাহাড। তার মধ্যে দেখলাম একটি পাহাড় বেশ পরিষ্কার। নীচের দিকে জঙ্গল আছে কিন্তু উপর জঙ্গল শূন্য। পাহাডটি কাল পাথরে মোডা। তাই তার উপর গাছপালা জন্মাবার সুবিধা পায় নি।

সেই পাহাড়ের উপর আমরা তাঁবু ফেললাম। পাশাপাশি দুটি বড তাঁবু। একটিতে আফ্রিকার তিনজন ইংরাজ শিকারী আর অন্যটিতে আমার সাহেব আর আমি রইলাম। আমাদের চারধারে অনেকগুলো ছোট ছোট তাঁবু খাটিয়ে তার ভিতর কুলিরা আড্ডা নিলে। রাশি রাশি লতা, পাতা, কাঠ যোগাড় করে কুলিরা রাত্রে তাঁবুর চারপাশে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করলে। পরদিন শিকারে যাওয়া হবে এই ঠিক করে আমরা সেদিন আর রাতটা তাবুতেই কাটালাম।

যে করে রাত্রি কাটলো, তা আর বলে কাজ নেই। আফ্রিকার

মত দেশে রাত্রিবাসের পর আবার দিনের আলো দেখার আশা করাই উচিত নয়। কেবল সঙ্গে ওই দেশেরই অসভ্য লোকদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাই রক্ষে। তারা তাঁবুর চারিদিকে এমনভাবে আগুন জ্বেলে রেখেছিল যে সেই পাহাড়ে উঠতে কোন জানোয়ারের সাহস হয় নি।

প্রত্যূষে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে সবাই তৈরী হয়ে পড়লাম! রীতিমত সাজসরঞ্জাম সঙ্গে নেওয়া হল। দশজন দেশীয় কুলিকে তাঁবু রক্ষার জন্যে রেখে, বাকি চল্লিশ জনকে নিয়ে আমরা পাঁচজন শিকারা যাত্রা করলাম। কুলি দশজন সমানে আগুন জ্বেলে রেখে, তীর ধনুক, বর্শা ইত্যাদি নিয়ে তাঁবু পাহারা দিতে লাগলো।

আমাদের বিরাট দলটি নদীর ধারে ধারে সারি দিয়ে চলতে লাগলো। কিছুদূর গিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢোকা হবে এই রকমই আমাদের মতলব ছিল। সিকি মাইল যেতেই দেখি একটা বোট। সকলে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। একি! এখানে, এই জঙ্গলের ভেতর বোট কে আনলে? সকলে বিস্মিতভাবে বোটটার দিকে চেয়ে এগুচ্ছি, হঠাৎ শিকারী সাহেবদের মধ্যে একজন চিৎকার করে উঠলে— "Hallo, That's the boat." আমরা অবাক্ হয়ে গেলাম।

শিকারী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন,—"মাস দুই আগে ইউগ্যাণ্ডার বৃটিশ সেনানিবাস থেকে দুজন শিকারী আর পাঁচ ছয়জন অনুচর এই জঙ্গলে শিকার করতে আসেন। তাঁরা বেলজিয়ান কঙ্গোর কোন সহর হতে এই বোটখানি নিয়ে কঙ্গো নদী বেয়ে ক্রমেই শিকার করে বেড়াতে থাকেন। তারপর তাঁরা এই শাখা নদীতে ঢোকেন। তার পরদিনই এই জঙ্গলের মানুষ-খেকো বুনো লোকদের নজরে পড়ে তাঁরা তাদের হাতে বন্দী হন।

বুনোরা তাঁদের সকলকেই আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। কেবল অনুচরদের মধ্যে একজন লোক তাদের হাত এড়িয়ে অতিকষ্টে পালিয়ে যায় ও ইউগ্যাণ্ডায় ফিরে এই ভয়ানক গল্প করে। তারপর অনেক অনুসন্ধান হয়েছিল বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সেই বুনোদের বা এই বোটের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নি। এতদিন পরে যে বোটখানি আমরা দেখলাম এটি সেই বোট।

শিকারা সাহেবের কথা শুনে আমার তো চক্ষুস্থির। বাপরে! কি ভয়ানক দেশ! এখানে মানুষ এমন হিংস্র! এমন ভয়ঙ্কর! এমন অসভ্য!

বোটখানির পরিচয় পাবার পর আমাদের সকলেরই মনে একটা নতুন প্রশ্ন জেগে উঠলো। তবে তো সেই নরখাদক অসভ্যেরা নিকটেই কোথাও আছে। পাহাড়ের উপর আমাদের তাঁবু দেখে তারা তো তাঁবু আক্রমণ করতে পারে! মাত্র দশজন অনুচরকে আমরা তাঁবু পাহারায় রেখে এসেছি। তাদের কাছে রাইফেল বা কোন মারাত্মক অস্ত্র নেই। শুধু তীর ধনুক আর বর্শা নিয়ে তারা অসভ্যদের আক্রমণে বাধা দিতে পারবে তো? শেষে হয়তো তারাও ওই নরখাদকের পেটে যাবে। আর আমাদের তাঁবু, রসদ, সাজ-সরঞ্জাম, খাদ্য, ওই বুনোরা দখল করে নেবে। তাহলে উপায়?

প্রায় আধঘণ্টা ধরে অনেক যুক্তিতর্কের পর স্থির হলো যে আমাদের পাঁচজন শিকারীর এক সঙ্গে শিকারে যাবার প্রয়োজন নেই। আমাদের মধ্যে দুজনকে তাঁবু পাহারার জন্যে ফিরে যেতে হবে। আর এই যে চল্লিশজন অনুচর আমাদের সঙ্গে রয়েছে, এদেরও শিকারে টেনে নিয়ে যাবার কি দরকার? শিকারের কাজে

পাঁচজন হলেই যথেষ্ট। বাকি পঁয়ত্রিশ জন কুলি দুজন শিকারীর সঙ্গে তাঁবুতে ফিরে যাক্।

পরামর্শ মত ইউগ্যাণ্ডার শিকারীদের মধ্যে দুজন সাহেব কুলিদের নিয়ে তাবুতে ফিরে গেলেন। অসভ্যদের উপর তাঁদের ভয়ানক আক্রোশ। তাঁরা এই সুযোগে অসভ্যদের উচিত শিক্ষা দেবার সঙ্কল্প আটলেন। আমরা তিন জন শিকারী অর্থাৎ আমি, আমার সাহেব, আর একজন ইউগ্যাণ্ডার ইংরাজ, পাঁচজন কুলির সঙ্গে সেই বোটখানি দখল করে বসলাম। বোটটিতে চারটি দাঁড় ছিল। চারজন কুলিকে দাঁড়ে বসিয়ে দিয়ে আমরা রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। যদি বুনোরা আমাদের অনুসরণ করে, তাহলে জন্তু জানোয়ারের বদলে তাদের শিকার করেই আমাদের শিকারের সাধ মিটিয়ে নেব।

বোট চালিয়ে মাত্র দুশো হাত এগিয়েছি এমন সময় হঠাৎ তীরের দিকে নজর পড়তেই দেখলাম একটা নরখাদক ঝোপের আড়াল হতে আমাদের লক্ষ্য করছে। কি অদ্ভুত তার চেহারা। মিস্‌কালো রং, গোল গোল ভাটার মত চোখ, লম্বা মুখ আর উলুখড়ের মত রুক্ষ, ঝাকড়া চুল! সাজসজ্জাও তার অদ্ভুত। কোমরে কাপড় নেই কিন্তু মাথায় শকুনের পাখার টোপর! গলায় হাড়ের মালা আর হাতে কি সব লতা-পাতার গয়না।

বুনোটা উঁকি দিয়ে আমাদের গতিবিধি দেখে নিয়ে বোধ হয় তার দলে খবর দেবার জন্যে যাচ্ছিল। কিন্তু তার সে মতলব আর কাজে পরিণত হলো না। ইউগ্যাণ্ডার শিকারী সাহেবটি বোট হতেই তাকে লক্ষ্য করে রাইফেল ছুঁড়লেন! আর সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় গুঁজে অসভ্যটা ঝোপের মধ্যেই পড়ে গেল! আমরাও তাড়াতাড়ি

বোট চালিয়ে সুমুখ দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। চারটি দাঁড়ের টানে আমাদের বোটখানা তর্ তর্ করে চলতে লাগলো আর আমরা বসে দুধারের তীরে নানা জন্তু জানোয়ারের খেলা দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

বোটের দুপাশের নদীর জলে কুমীরেরা দলে দলে ভাসছে। কতকগুলো বোটের পিছনে ধাওয়া করছে। কিন্তু চলন্ত বোটের উপর থেকে মানুষ ধরে খাওয়া মোটেই সুবিধাজনক নয় বলে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারছে না। মাঝে মাঝে বোটের পথে এক একটি এমন ভাবে পড়তে লাগলো যে বাধ্য হয়ে তার উপর দিয়েই বোট চালাতে হলো।

কুমীরগুলোর দিকে আমাদের লক্ষ্য মোটেই নেই। সঙ্গের পাঁচজন কুলিই তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে লাগলো। আমরা তিনজন কেবল বিস্মিত দৃষ্টিতে তীরের উপর জানোয়ারদের কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম।

সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। এমন জন্তু জানোয়ারের ঘটা আমি তো কখনও দেখিনি। এক এক স্থানে এক এক রকমের জানোয়ার—দলে দলে পালে পালে দেখা যেতে লাগলো!

প্রথমেই চোখে পড়লো বানরের পাল। সে যে কত রকমের আর কত আকারের বানর তা তোমাদের কি বলবো। কোনটা বড়, কোনটা ছোট, কোনটার লম্বা মুখ, কোনটার গোল,—সব যেন অদ্ভুত রকমের!

তাদের ডাকও নানা রকমের। তারা আমাদের দেখে ভয় পেয়েছিল। কেন না তারা দলে দলে এক গাছ হতে অন্য গাছ, আবার সে গাছ থেকে অন্য গাছে লাফিয়ে ডাকতে ডাকতে দূরে পালাতে লাগলো। কতকগুলো মাটির উপর দিয়েই লাফাতে

লাফাতে ছুটলো। আমরা তাদের দল পার হয়ে ক্রমে এগিয়ে যেতে লাগলাম!

সহসা চোখে পড়লো এক রকম অদ্ভুত বানর! গায়ে লম্বা লম্বা লোম আর মুখখানি যেন শুধু গোঁফ দিয়েই ভরতি! দুষ্টুমি ভরা চঞ্চল চোখে শুধু কৌতূহলের উঁকিঝুঁকি!

মা ও মেয়ে বুঝি চুপিসাড়ে একটি জায়গায় নিঃশব্দে বসে ছিল! আর সেইখান থেকে আমাদের লক্ষ্য করছিল।

এমন অদ্ভুত জীব আমরা আর কখনও দেখি নি। সাহেবের শখ হলো, বাচ্চাটাকে তিনি ধরে তাঁর দেশে নিয়ে যাবেন। কিন্তু মাতার পাশে থাকতে সে কি সম্ভব? কাজেই তাদের দিকে চোখ রেখেই, তিনি তাঁর রাইফেল তুলে নিলেন সন্ধানের জন্য!

কিন্তু সাহেবকে দেখেই তাদের সন্দেহ হয়েছিল, বিপদের অনুভূতি যেন তাদের আগে থেকেই পেয়ে বসেছিল। কাজেই সাহেব তাঁর বন্দুক তোলামাত্র তাদের একটা আর্ত্ত চীৎকার সহসা চতুর্দ্দিকে মুখরিত হয়ে উঠলো!

দুঃসাহসী সাহেব হয়তো তবু কোন কিছুই গ্রাহ্য করতেন না; কিন্তু সহসা এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল, যার ফলে সুসভ্য ইংরেজের মান-মর্য্যাদা বুঝি মুহূর্ত্ত মধ্যে ধুলোয় লুটিয়ে পড়লো!

কোথা হতে ছুটে এলো এক অপরূপ বানর! এতক্ষণ যাদের দেখছিলাম, তারা ছিল গুঁফো বানর; কিন্তু এখন সহসা যিনি উপস্থিত হলেন, তিনি এক বিরাট চেহারার দাড়িওয়ালা বানর!

এই নবাগত বানরটি বুঝি আশেপাশেই কোথাও লুকিয়ে ছিল! স্বগোত্র অপর দুটি বানরের বিপদ্ দেখতে পেয়ে, সে আর স্থির

থাকতে পারলো না। ধপ্ করে সাহেবের রাইফেলের নলের ওপরেই সে কোথা হতে লাফিয়ে পড়লো!

এত বড় একটা জন্তুর এই আকস্মিক পতনে সাহেবের হাত থেকে রাইফেলটি পড়ে গেল, তিনি কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন! বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আমরাও সবাই মিলে বানরটির দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সাধারণ বানরের চেয়ে এ বাঁদর আকারে অনেক বড়; অনেক বেশী বলিষ্ঠ বলেও মনে হয়। দেহের রং পিঠের দিকে কালো ও পাটকিলে, কিন্তু গলা ও পেটের অংশ দিব্যি সাদা ধব্‌ধবে।

পরম নিঃশঙ্কভাবে সে এসে উদয় হলো। মুখ দেখে মনে হয় যেন 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব। তার দুচোখে যেন জ্বলন্ত আগুনের গোলা ও কঠোর তিরস্কার।

ধীরে ধীরে চলে গেল সে। আমরাও অপরাধীর মত মাথা নীচু করে সেখান থেকে এগিয়ে চলতে সুরু করলাম।

তারপর দেখলাম আবার এক রকমের অদ্ভুত বানর। সাহেব বললেন, তাদের নাম কেশরী বানর। বাস্তবিক কেশরীই বটে: বানর হলেও তাদের দেখলে কেশরী অর্থাৎ সিংহ বলেই ভ্রম হয়। যেমন সিংহের মত মুখ, তেমনি আবার তাদের ঘাড়ে সিংহেরই মত কেশর। গঠনটাও অনেকটা সিংহের মত। নদীর ধারে মাটির উপর তারা বেড়াচ্ছে। আমাদের দেখে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, তারা দাঁত খিঁচিয়ে আমাদেরই ভয় দেখাতে লাগলো। সাহেব কৌতূহল পরবশ হয়ে তাদের একটাকে গুলি করলেন।

এই আর যাবি কোথা? সেটা তখনই মলো বটে কিন্তু তাই

দেখে দলে দলে কেশরী বানর এসে সেখানে জড় হলো। কি তাদের রাগ! কি আস্ফালন! কি দাঁত খিঁচুনি! বোধ হয় আমাদের পেলে তারা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। আমরা যদি বোটে না থাকতুম আর আমাদের আর তাদের মধ্যে যদি নদী না থাকতো, তাহলে যে কি হতো তা বলা যায় না। একসঙ্গে একশো কি দেড়শো ক্রুদ্ধ কেশরী বানরের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষা করা কিছুতেই সম্ভবপর হতো না। যাহোক আমরা খুব জোরে দাঁড় টেনে তাদের ছাড়িয়ে চলে গেলাম।

তারপরেই চোখে পড়লো একদল জেব্রা। কি সুন্দর গঠন! কি সুন্দর তাদের রং! ঈষৎ হলদে রঙের উপর লম্বা লম্বা কালো ডোরা, আর গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট চেহারা।

আর কিছুদূর এগিয়ে যেতে একটা প্রকাণ্ড ফাঁকা জায়গা দেখতে পেলাম। তীর হতে বহুদূর পর্য্যন্ত ফাঁকা! গাছপালা নেই বললেই হয়। দেখলাম দূরে অনেকগুলি হরিণ মনের সুখে চরছে। হরিণগুলোকে দেখে শিকার করবার খুব ইচ্ছা হলো কিন্তু সেগুলি অনেক দূরে আছে বুঝে আমরা সে আশা ত্যাগ করলাম! কারণ এ রকম ফাঁকা জায়গায় হরিণের পিছনে তাড়া করে শিকার অসম্ভব। আমাদের একটু সাড়া পেলে নিমেষে তারা যে হাওয়ার মত কোথায় মিশিয়ে যাবে তা আর বলতে! অগত্যা আমরা আরও এগিয়ে চললাম।

কিছুদূর যেতেই ফাঁকা উপত্যকাটি শেষ হয়ে আরম্ভ হলো পাতলা জঙ্গল। ছোট ছোট ঝোপ আর মধ্যে মধ্যে এক একটি বড় গাছ। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কোন জানোয়ারই আমাদের চোখে পড়লো না।

আমরা আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। এতখানি স্থান জানোয়ার শূন্য থাকার কারণ কি ?

হঠাৎ একটা বিকট গর্জ্জন শোনা গেল। সাহেব দুজন চমকে উঠে বললেন, "সিংহ সিংহ।" আমরা বোটের উপর উঠে দাঁড়িয়ে তীরের দিকে চেয়ে দেখলাম হাঁ সিংহই বটে। তীর হতে প্রায় চারশো হাত দূরে একটা প্রকাণ্ড সিংহ, মরা একটা হরিণের বুকের উপর বসে গর্জ্জন করছে।

আমরা বোটের উপর দাঁড়িয়ে কেমন করে সিংহ মহারাজকে শিকার করা যায় সেই সম্বন্ধে যুক্তি আঁটছি—এমন সময় আর একটা সিংহকে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। পরক্ষণেই হরিণটির জন্যে দুই পশুরাজের মহাসমর বেধে গেল।

সাহেবরা আর অপেক্ষা করতে চাইলেন না। এক সঙ্গে দুটি সিংহ শিকারের লোভ কি ছাড়া যায়? তাঁরা দুজন তীরে নেমে পড়লেন। কুলিদের মধ্যে মাত্র একজন তাঁদের সঙ্গে গেল। অবশিষ্ট চারজন কুলির সঙ্গে আমি বোটের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম।

ঘাসের আড়ালে গুড়ি মেরে প্রায় দুশো হাত এগুবার পর দুজন শিকারী মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসলেন। সিংহ দুটি তখনো সমান ভাবে যুদ্ধ করছে।

সাহেব দুজন রাইফেল তুলে ধরে তাগ্ করতে লাগলেন। তারপর একসঙ্গে দুজনেরই রাইফেল গর্জ্জন করে উঠলো। একটি সিংহ তৎক্ষণাৎ মাটিতে শুয়ে পড়লো। কিন্তু অপরটির আঘাত বোধ হয় তেমন গুরুতর হয়নি। সে একেবারে আকাশ ফাটা গর্জ্জন করে তীরবেগে সাহেবদের দিকে তেড়ে এল। তার সে সময়ের সেই

মূর্ত্তি, সেই দাঁত খিঁচুনি, আর সেই গর্জ্জন দেখে বোটের উপর হতেই আমার বুক গুর গুর করে সারা গায়ে ঘাম বেরুতে লাগলো। মনে করলাম সাহেবদের আর রক্ষা নেই। কিন্তু তাঁদের ভাগ্য ভাল তাই আর একটা গুলি তার মাথায় বিঁধতেই সিংহটা অর্দ্ধেক পথে ঘাড় গুঁজে পড়ে মরে গেল।

এক সঙ্গে দুটো সিংহ শিকার। এত সৌভাগ্য সহজে সকলের ভাগ্যে মেলে না। আমরা সকলেই মহা খুসী হলাম। সিংহ দুটিকে বোটে তুলে নিয়ে আমরা আবার সুমুখ দিকে অগ্রসর হলাম।

কিছু দূর যাবার পর আমাদের দক্ষিণ ধারে এই শাখা নদীর আর একটি উপশাখা দেখতে পেলাম। শাখাটি খুব অল্প পরিসর। আমরা বোটে দাঁড়িয়ে গলা উঁচু করে দেখলাম প্রায় পাঁচশো হাত দূরে একদল জিরাফ চরে বেড়াচ্ছে। সাহেব বললেন, "যে অঞ্চলে জিরাফ থাকে, সেই স্থানই শিকারের পক্ষে খুব উপযুক্ত।" অগত্যা সেই-খানেই বোট ছেড়ে তীরে ওঠবার মতলব করা গেল। তারপর সেই ত্রিমোহনার মুখে আমাদের বোটটিকে বেশ করে বেঁধে রেখে, আমরা সদলবলে বরাবর জঙ্গলের দিকে এগুতে লাগলাম।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমরা সেই জঙ্গলটিতে গিয়ে ঢুকলাম। জঙ্গলটি দূর হতে যত ঘন বলে বোধ হয়েছিল, বাস্তবিক সেটি তত ঘন নয়। দশ পনের বিশ হাত অন্তর এক একটি প্রকাণ্ড গাছ আর তার মাঝে মাঝে দুচারটি গুল্ম। সেখানকার জমি মোটেই সমতল নয়। খুবই উঁচু নীচু আর স্যাঁতসেঁতে।

একটু আগেই একটা জলাভূমি আছে বলে মনে হলো। জঙ্গলটার ভিতর ঢুকেই একটা খড় খড় শব্দ শুনতে পেলাম। চারদিকে

চাইতেই দেখলাম একটা বুনো হাতী শুঁড় দিয়ে গাছের ডাল ভেঙে পাতা খাচ্ছে। হাতীটা বেশী বড় নয়। বোধ হয় দু তিন বৎসরের বাচ্চা হবে। সাহেব তাড়াতাড়ি রাইফেল বাগিয়ে ধরলেন। সঙ্গের কুলিরা তাঁকে গুলি চালাতে নিষেধ করলে। কিন্তু তিনি সে কথায় কান দিলেন না।

সুমুখে এমন শিকার! এ সময় কি কারও মানা শোনা যায়!

সাহেব যেমন গুলি চালিয়েছেন আর হাতীটা শুঁড় উঁচু করে মর্ম্মভেদী চীৎকার জুড়ে দিলে। চীৎকারে যেন জঙ্গলটা কেঁপে উঠলো। বন-জঙ্গল ভেঙে, গাছপালা কাঁপিয়ে প্রচণ্ড ঝড়ের মত বুনো হাতীর পাল দু দিক থেকে আমাদের দিকে তেড়ে আসতে লাগল।

সেই উদ্ধত মূর্ত্তি দেখে সবারই পিলে চমকে গেল। তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করে প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারলাম ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলাম।

পড়ি কি মরি করে ছুটছি। আমার মাথার হ্যাট ও সাহেবের হ্যাভারস্যাকটি পড়ে গেল। কিন্তু সে সব তখন দেখে কে? তখনকার চিন্তা শুধু ছুট আর ছুট!

এমন ভাবে ছুটে আর কতদূর যাওয়া যায়? প্রতিক্ষণেই মনে হতে লাগলো এইবার বুঝি পিছন থেকে শুঁড় বাড়িয়ে হাতীগুলো আমাদের ধরে ফেললে।

যে দিকে খাল আমরা সেই দিকেই ছুটছিলাম। আশা, যদি খালটা সাঁতরে পার হয়ে ওপারে গিয়ে রক্ষা পাই। কিন্তু যখন তার ধারে এসে পড়লাম তখন দেখলাম খাল পার হতে যাওয়া মানে সাক্ষাৎ যমের মুখে লাফিয়ে পড়া। কারণ খালের যে স্থানটিতে এসে

পড়লাম সেখানটার চওড় গনের হাতের বেশী না হলেও তার জলে কুমীরের দল যেন কিলবিল করছে। সর্ব্বনাশ! এখন উপায়?

একটা প্রকাণ্ড গাছের লম্বা ঝুরি দড়ির মত নেমে এসে ঠিক আমাদের মাথার উপরে ঝুলছিল। গাছটা খুব পুরাণো আর তার দুতিনটে মোটা মোটা ডাল খালের ওপার হতে এপার পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। তারই একটা ঝুরি টপ করে ধরে দোল খেয়ে ওপারে গিয়ে মাটিতে পড়লাম। ঝুরিটা তখনি আবার স্বস্থানে ফিরে আসতেই সাহেব সেটাকে ধরে ফেললেন। তখন হাতীগুলো তাঁর পিছনে পাঁচ ছ হাতের মধ্যে এসে পড়েছে। সাহেব ঝুরিটা ধরেই আমার মত করে দুলে এ পারে এসে পড়লেন।

হাতীগুলোর হাত হতে নিষ্কৃতি লাভ করলেও আমাদের বিপদ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। কারণ দূর পানে চেয়ে দেখলাম আরও আট দশটা হাতী এই দিকে ছুটে আসছে। তাদের দুটোর শুঁড়ে দুজন হতভাগ্য কুলির মৃতদেহ বিজয় নিশানের মত উঁচুতে তুলে ধরেছে।

ভাবলাম—নাঃ! এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ্ নয়।

বেগতিক বুঝে আমরা আর না দাঁড়িয়ে কেবলই ছুটতে লাগলাম! খালের এপাশে জঙ্গল বিশেষ গভীর নয়। সুমুখেই একটা খুব লম্বা জলা দেখলাম। আমরা সেই জলার তীর ধরে ছুটলাম।

জলার এক স্থানে প্রায় পঞ্চাশটি বুনো মহিষ জলে গা ডুবিয়ে বসে ছিল। তাই প্রথমটা আমরা তাদের দেখতে পাইনি। মহিষগুলো কিন্তু আমাদের দেখে এক সঙ্গে ফোঁস্ ফোঁস্ করে উঠলো।

দেখলাম—মহামুস্কিল। হাতীর হাত থেকে যদি বাঁচলুম, এবার বুঝি আবার বুনো মহিষের হাতেই পড়তে হয়।

মহিষেরা বড় সাধারণ জীব নয়। এরা যখন দলে থাকে তখন সিংহ বা বাঘ কোন পশুই এদের কাছে আসতে সাহস করে না। এদের আবার একতা খুব। একটা মহিষ যদি তাড়া করে, তাহলে দলের সব গুলোই তাই করবে। এক সঙ্গে এতগুলো মহিষে তাড়া করলে গেছি আর কি! কাজেই আবার উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে হলো।

মহিষগুলো আমাদের তাড়া করলে না বটে কিন্তু তবু আমাদের বিপদ্ কাটলো না। আমরা জলার তীর বেয়েই ছুটছিলাম। কিছু দূর যেতেই তিনটি জলহস্তী দূর থেকে আমাদের ছুটতে দেখে তাড়া করলে।

তাদের প্রকাণ্ড আকার দেখে আমাদের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে গেল। তবু সাহসে ভর করে সাহেব তাদের একটাকে গুলি করলেন। গুলিটা তার থুতনিতে গিয়ে লাগতেই সে একটা ভয়ানক আওয়াজ ছাড়লে। তারপর তারা তিনটিতে মিলে আমাদের দিকে তেড়ে আসতে লাগলো।

আর গুলি চালাবার অবসর পাওয়া গেল না। জলহস্তীগুলো এমন বেগে ছুটে আসছে যে একটাকে গুলি করবার সঙ্গে সঙ্গে আর দুটো ঘাড়ে এসে পড়বে। কাজেই গুলি করবার চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমরা ছুটতে লাগলাম।

কি মুস্কিলেই পড়েছি। শিকার করতে এসে এমন মুস্কিলে বোধ হয় কেউ কখনো পড়েনি। বিপদের উপর বিপদ্। স্থির হয়ে একটু দাঁড়িয়ে যে ভাববো, তার অবসর নেই।

ক্রমাগত ছুটতেই হচ্ছে। কিন্তু আর ছোটা সম্ভব নয়। আমাদের দম ফুরিয়ে এসেছে। পা দুটো বেজায় ভারী হয়ে উঠেছে। শরীরও যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে। বুঝি মাথা ঘুরেই পড়ে যাই। তা হলেই আর কি? একেবারে দফারফা।

সাহেব বললেন, "ওহে! চলো একটা গাছে উঠি। নইলে রক্ষা পাওয়া ভার।" তিনি একটা প্রকাণ্ড গাছের দিকে ছুটলেন। আমিও তাঁর পাছু নিলাম। তিন মিনিটের মধ্যেই আমরা গাছের তলায় এসে হাজির।

পাশাপাশি দুটি প্রকাণ্ড গাছ। আমরা তার একটিতে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। উঠতে উঠতেই জলহস্তীগুলো তার তলায় এসে পড়ল।

জলহস্তীগুলোর দাপাদাপি শুনতে শুনতে আমরা উপরে উঠতে লাগলাম। তারপর সুবিধামত একটা মোটা ডাল পেয়ে আমরা দুজনে তার উপরে বসলাম।

তখন দুজনেই বেদম হাঁপাচ্ছি। ভাবলুম একটু দম ঠিক করে নি। তারপর জানোয়ারগুলোর দফা শেষ করবো। যখন গাছে উঠেছি, তখন আর ভয় কি?

কিন্তু ভাগ্যটা আমাদের খুবই খারাপ ছিল। তাই নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করা আর ঘটে উঠলো না। গাছ থেকে নামতে হলো তক্ষুণি।

কারণ, কিছু দূরে, বিরাট এক প্রান্তর পেরিয়ে যে বন, মনে হলো তারই আড়াল থেকে খুব হৈ-হল্লার শব্দ ভেসে আসছে! কি ব্যাপার জানবার জন্য সকলের প্রাণেই জেগে উঠলো এক কৌতূহল!

কিন্তু কৌতূহল জিনিসটা যে সব সময় ভাল নয়, একথা কি তখন মনে ছিল? কাজেই শুধু কৌতূহল মেটানোর জন্যে মাটিতে নামবার ইচ্ছে হলো। কিন্তু শত্রু তখনও যে আমাদের পায়ের তলায়ই বসে ছিল। জলহস্তীগুলো তখন পর্য্যন্ত গাছের তলা ছেড়ে যায়নি, নামলেই বিপদ্!

মনে মনে যখন এমনি সব ভাবছি, ঠিক সেই সময় গাছের তলা দিয়ে হঠাৎ ছুটে পালালো এক বাচ্চা সিংহ!

কিন্তু বাচ্চা হলেও সিংহ তো বটে! সিংহের হিংস্রতা ও গর্জ্জন তার মধ্যে পূরোপূরিই ছিল। ছুটবার সময় সে তার হুঙ্কারে যে বিভীষিকার সৃষ্টি করে গেল, জলহস্তীগুলো তাতে ভয় পেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ইতস্ততঃ ছুটে পালালো।

এ হলো আমাদের শাপে বর! নামবার সুযোগ খুঁজছিলাম। এইবার আমরা সেই সুযোগ পেয়ে গেলাম!

তবু সভয়ে ধীরে ধীরে আমরা নেমে এলাম। কি জানি কোথায় কোন বাধাবিঘ্ন আছে, কে জানে?

মাটিতে নেমে আমরা সবাই একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। না, আর কোন বিপদের আশঙ্কা দেখছি না! বাচ্চা সিংহটা এলো কোত্থেকে, তাই ভেবে একটু উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম। যাক্, এতক্ষণে আমাদের সেই উদ্বেগ দূর হলো। আমরা ধীরে ধীরে ঐ গোলমাল লক্ষ্য করে বন পেরিয়ে যেতে সুরু করলাম।

কিছুদূর যেতেই আমরা বুঝতে পারলাম, গোলমালটা কোথায় ও কিসের!

এ দেশীয় একটি লোক আমাদের দিকেই আসছিল। আমাদের

সঙ্গে যে সব মুটে-মজুর ছিল, তাদের অনেকেই ছিল এদেশী লোক। তারাই জিজ্ঞেস করলো ঐ আগন্তুক লোকটিকে, "এত হৈ-হল্লা হচ্ছে কেন ?"

কথাটা শুনে সে প্রথমে কিছুক্ষণ হাসতেই থাকে। তার মানে সে বোঝাতে চায়, এত বড় একটা খবর, অথচ তার কিছুই জান না ? এর পর সে বলে, "ওদিকে সিংহ-শিকারীর দল সিংহ শিকার করতে বেরিয়েছে। বন জঙ্গল পিটিয়ে, খুঁজে পেতে, হৈ-হল্লা করে তারা ছুটছে। তারই এত গোলমাল।

তোমরা দেখতে চাও তো দেখোগে। কিন্তু একটু সাবধানে চলাফেরা করো। কি জানি কোথায় কোন্ সিংহ লুকিয়ে আছে ! চলতি পথে সে যদি তোমাদের কাউকে পায়, তাহলে তো আর ছেড়ে দেবে না ! এক চড়ে লাশ বানিয়ে, কাঁধে ফেলে নিয়ে যাবে।"

কথা শুনে সাহেবরা এক মুহূর্ত্ত একটু চিন্তা করলেন, তাহলে কি এখন করা উচিত ? তাঁরা সিংহ শিকার দেখতে বিপদের মুখে এগিয়ে যাবেন, কি পরম নিশ্চিন্তে কোথাও আশ্রয় নেবেন !

কিন্তু আশ্রয় গ্রহণের কথাটা কেউ অনুমোদন করলেন না। কারণ, হাতে রাইফেল থাকতে তাঁরা ভীরুর মত দূরে সরে থাকবেন, এ ব্যবস্থা কারোই মনঃপুত হলো না।

আমিও মনে মনে এ জিনিসটাই চাইছিলাম। আফ্রিকায় এসে সে দেশীয় শিকার-পদ্ধতি দেখবো না—বিশেষ করে সিংহ-শিকার, একথা আমি একেবারে ভাবতেই পারিনি। কাজেই আফ্রিকার অধিবাসীদের সিংহ-শিকার দেখার সুযোগ পেয়ে আমার খুব আনন্দই হলো। মনে মনে সাহেবদের আমি অভিনন্দনই জানালাম।

আমরা দ্রুত পায়ে বনের ওপারে সিংহ-শিকার দেখতে এগিয়ে চললাম।

যেয়ে দেখি, বনের প্রান্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে। বিচিত্র বেশভূষায় শিকারীর দল ও অগণিত নরনারী তাদের দর্শক। আট-দশ বছরের শিশুরা পর্য্যন্ত দল বেঁধে ছুটে এসেছে সিংহ-শিকার দেখবে বলে। এ যে একটা বিপজ্জনক কাজ, সে খেয়ালই যেন নেই! আফ্রিকায় এসব জিনিষ যেন জল ভাতের মতই সহজ ও স্বাভাবিক!

শিকারী ও আমাদের মধ্যে ব্যবধান ছিল অনেক। ইচ্ছে করেই আমরা একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলুম। কারণ, আজকের এ শিকার ওদেরই নিজস্ব, ওরাই এর নায়ক। এতে আমাদের কোন হাত নেই, আমরা কোন হস্তক্ষেপও করবো না।

তবে ঐ শিকারীদের কাজে আমরা কোন বাধা সৃষ্টি না করি, অথবা আমরা নিজেরাও কোনভাবে ঘায়েল না হই, শুধু এইটুকুই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। তাই কিছুদূরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখে যাওয়াই ছিল আমাদের অভিপ্রায়।

ঘটনাস্থলেও আমরা তেমনি ভাবেই যেন সংযত থাকি, আমাদের নিজেদের মধ্যে তখনও সেজন্য অতি চাপাস্বরে পরামর্শ চলছিল। কিন্তু সহসা একটা প্রচণ্ড হুঙ্কারে সমস্ত সংযম ও নীরবতা মুহূর্ত্ত মধ্যে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল!

শিউরে উঠলাম সকলেই। তারপর ব্যাপার কি বুঝবার জন্য ভাল করে তাকাতেই দেখি এক ভয়ানক কাণ্ড!—

ভীষণ গর্জ্জন করে দু দুটো সিংহ আমাদের মাঝখানে সশব্দে

লাফিয়ে পড়লো। তারপর চক্ষুর নিমেষে একটা সিংহ দর্শকদের একটাকে এক প্রচণ্ড আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিয়েই আবার এক লাফে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিন্তু বিপদ্ হলো অপর সিংহটির। সে বেচারা আর পালাবার পথ খুজে পায় না। চতুর্দ্দিক থেকে প্রায় আট-দশটা বর্শা তাকে লক্ষ্য করে আঘাত হানতে উদ্যত হলো!

বেচারা সিংহ বুঝি মুহূর্ত্তের জন্যই বিব্রত বোধ করছিল! তারপর সেও নিকটবর্ত্তী এক শিকারীকে তার বিশাল থাবার এক আঘাতে মাটিতে শুইয়ে দিল। আব নিজে সে পাহাড়সমান উঁচু এক লাফ দিয়ে পাশ কেটে বেরিয়ে গেল!

আমার হাতটা একবার নিশ্ পিশ্ করে উঠেছিল গুলি ছুঁড়বার জন্য। কিন্তু আমার সাহেবের ইঙ্গিত পেয়ে আমি তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করে নিলাম।

সাহেব পরে আমাকে এর কারণ বুঝিয়ে বলেছিলেন, "সিংহ যদি তখন আমাদের হাতে প্রাণ হারাতো, তাহলে ঐ শিকারী দলের প্রত্যেকের আত্মসম্মানে আঘাত লাগতো।

তারা কেউ তা বরদাস্ত করতে পারতো না। ফলে, আমাদের সঙ্গে ওদের একটা শত্রুতার সৃষ্টি হতো। বিশেষতঃ, তুমি তো জানো যে, আমাদের মধ্যে আগে থেকেই একটা সিদ্ধান্ত ছিল যে, আমরা এই শিকারে কোন অংশ গ্রহণ করবো না। তা সত্ত্বেও তুমি তার অন্যথা করতে যাচ্ছিলে কেন ঝণ্টু?"

আমি আমার সাহেবের কথা শুনে খুবই লজ্জিত হলাম। আমি বললাম, "আমার খুবই অন্যায় হয়েছে স্যার! আমায় মাপ করবেন।"

মৃদু হেসে সাহেব বললেন, "না না, এতে ক্ষমা চাইবার কিছু নেই। গুলি যখন ছোঁড়নি একবারও, তখন আর অপরাধ হলো কোথায়? কাজেই তোমার ক্ষমা চাইবার কথাই ওঠে না।"

ওদিকে সিংহ তো একটা শিকারীকে ঘায়েল করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল এক লাফে, কিন্তু তাতেই কি বাঁচতে পারলো? অপর এক শিকারী তার বর্শামাত্র সম্বল করে তৎক্ষণাৎ তার অনুসরণ করলো।

আশ্চর্য্য সাহস। আমরা যেখানে রাইফেল নিয়ে সিংহের সম্মুখীন হতে সাহস পাই না, সেখানে শুধু এক বর্শা হাতে আর কোমরে একটি ছুরি নিয়ে, দুরন্ত সিংহের অনুসরণ করা, সে কি সহজ কথা?

আফ্রিকার বীর শিকারীর সাহস দেখে আমাদের মাথা বুঝি নুয়ে পড়েছিল! শিকারী ও শিকার তখন যে প্রান্তর দিয়ে ছুটছিল, তার সম্মুখেই এক নিবিড় বন।

সিংহ জানে, একবার যদি সে ঐ দুর্ভেদ্য বনে ঢুকতে পারে, তাহলেই সে নিরাপদ। আর শিকারীও জানে সিংহকে যদি শিকার করতে হয়, তাহলে এই প্রান্তরের মধ্যেই করতে হবে। নইলে তার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হয়ে যাবে। কাজেই সে কেবলই তার সুযোগ খুঁজতে লাগলো!

কিন্তু সমানে সমানে সিংহের সঙ্গে ছোটা কি মানুষের সাধ্য? না, সে তা পেরেছে কখনও? তাই শিকারী ক্রমশঃই পিছিয়ে পড়ছিল।

তবু সে জানে, দশ-বিশ হাত পিছিয়ে পড়লে কি হবে? একটু পিছিয়ে পড়তে তার আপত্তি নাই; তার ফলে তার কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না; কিন্তু সে চায় তার সুযোগ, এক মুহূর্ত্তের একটু সুযোগ মাত্র!

শিকারী পিছিয়ে পড়েছে, কিন্তু সে তো পেছন থেকে বর্শা ছুঁড়তে চায় না। সে চায় একটু পাশ থেকে সিংহকে ঘায়েল করতে, নিদেন সিংহের গলায় বা বুকে যেন সে আঘাত হানতে পারে! তাই সে পেছনে পড়লেও কেবলই তার কিছু পরিমাণে পাশে পাশে থাকতে চায়। সর্ব্বক্ষণ সে শুধু তারই সুযোগের সন্ধান করছিল।

শিকারীর মতলব আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। আমি তাই কেবলই বিপদ্ গনছিলাম। আমি ভাবছিলাম, পেছন দিকে বর্শা ছুঁড়ে সিংহকে মারাত্মক আঘাত সে দিতে পারবে না। শুধু লাভ হবে এইটুকু যে, আহত সিংহের যে ভীষণ মূর্ত্তি, তা আমাদের দেখতে হবে, আর শিকারীর প্রাণটা বুঝিবা মাঠেই মারা যায়!

এমনি যখন সন্দেহের দোলায় আমরা দুলছি, তখন সহসা এক অঘটনই যেন ঘটে গেল!

সাহসী শিকারী সহসা এক ক্রুদ্ধ হুঙ্কার ছেড়ে উঠলো এক বিকট চীৎকারে। তার সেই চীৎকারে চোখের পলকে সিংহ ফিরে দাঁড়ালো তার দিকে। কিন্তু সিংহের দিক থেকে কিছুমাত্র আঘাত আসার পূর্ব্বেই শিকারীর বজ্রমুষ্টি শিথিল হলো; আর তার হাতের বর্শা উল্কার মত প্রচণ্ডবেগে ছুটে গেল সিংহের দিকে।

সিংহ আহত হলো ঠিক তার কপালের মাঝখানে।

আহত হলো বটে! কিন্তু মাটিতে পড়ে গিয়েও তক্ষুণি সে আবার উঠে দাঁড়িয়েছিল, সম্ভবতঃ প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ চারদিক থেকে ছুটে গেল আরও কয়েকখানি বর্শা, আর তাদের প্রায় সব কয়টি তাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেললো!

আর সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে ছুটে গেল সেই শিকারী যে তাকে সর্ব্বপ্রথম আঘাত করেছিল।

বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে সে তার ছুরিখানি সিংহের বুকে আমূল বিঁধিয়ে দিলে!

সিংহের অন্তিম চীৎকারে সারা বনস্থলী কেঁপে উঠলো—পাখীরা ভয়ার্ত্ত কলরব করে উঠলো গাছের ডালে ডালে।

শিকারীর ভাগ্যি ভাল বলতে হবে। কারণ, আর মাত্র কয়েকটি সেকেণ্ড দেরী হলেই সিংহ সেই গভীর বনে লুকিয়ে পড়তো। কিন্তু বনে ঢুকবার প্রায় প্রবেশ পথেই হলো তার চরম পরিণতি।

সিংহ প্রায় পালিয়ে যায় দেখেই শিকারী তার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য ওরকম চীৎকার করে উঠেছিল। আর সিংহ তার মুখ ফিরিয়েছিল সেই কারণেই। কিন্তু সেই মুখ-ফেরানোই হলো তার মৃত্যুর কারণ।

কিন্তু আহত সিংহ যেন মরেও মরে না! মাথায় শড়কি, পেটে পিঠে শড়কি, বুকে আমূল বিদ্ধ ছুরি, এসব সত্ত্বেও সে একবার একটু মৃদু গর্জ্জন করে নড়ে চড়ে উঠেছিল। তাই দেখে শিকারীদের একজন বললো, "ওরে, ওতো মরেনি এখনো!"

কথার সঙ্গে সঙ্গে সিংহের ওপর আবার নতুন করে অত্যাচার সুরু হলো। আর একজন গিয়ে তার দেহের সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করে সিংহের গলার ওপর চেপে দাঁড়ালো!

ব্যস্, তারপর আর কি! দেখতে দেখতে আর মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সিংহের প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল, শিকারীদের পায়ের তলায় তার অসাড় দেহটা শুধু পড়ে রইলো!

এতক্ষণে আমাদের সুযোগ এলো অভিনন্দন জানানোর! দেশী মজুরদের সাহায্যে আমরা একে একে ঐ শিকারীদের প্রত্যেককে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানালুম, তাদের সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা করলুম।

আমার সাহেব তো আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে, সেই প্রথম শিকারীকে তাঁর বুকে জড়িয়ে ধরলেন। স্পষ্ট বোঝা গেল, ওরাও সকলেই আমাদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছে!

এর পর কিছু সময় ওদের সঙ্গে কাটিয়ে আমরা আবার আমাদের যাত্রাপথে বেরিয়ে পড়লাম।

সারাপথ আমাদের মধ্যে কেবল ওদের সম্বন্ধেই আলোচনা চলছিল। কথায় বলে, "ঢাল নেই, তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার।" আফ্রিকার শিকারীদের দেখে আমার কেবল সেই কথাই মনে হচ্ছিল।

মনে হচ্ছিল বারবারই, সিংহ-শিকারে বেরিয়েছে কিন্তু একটা বন্দুক নেই। শড়কি আর ছুরি ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই ওদের, চরম বিপদের সময় যার ওপর ওরা নির্ভর করতে পারে! অথচ কী সাহস! গাছে বা মাচানে উঠে নয়, কোন আড়াল-আবডালে লুকিয়ে থেকে নয়, সিংহের সঙ্গে সমানে ছুটে গিয়ে ছোটার পাল্লা দিলে! তারপর পলায়মান সিংহের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাকে মুখ ফেরাতে বাধ্য করলো; আর সেই পরম মুহূর্ত্তেই শিকারী তাকে আঘাত করলো!

আমার ও সাহেবদের মধ্যে সারাপথ শুধু সেই আলোচনাই চলছিল। আমার সাহেব একবার আমাকে বললেন, "ঝণ্টু! আফ্রিকার বনে পা দিয়ে, আজকে যা দেখলুম, এর তুলনা নেই।

আমরা শিকার করি রীতিমত রাজসিক আয়োজনে! জঙ্গল-

'বীটার' থাকবে, হাতী-ঘোড়া থাকবে, মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র থাকবে, তারপর আমরা বহাল-তবিয়তে লুকিয়ে থেকে মুহুর্মুহুঃ গুলি বর্ষণ করবো!

এতটা সাবধানতা নিয়ে যে শিকার করবো, তারই নাম হবে আমাদের শিকার! আর সেই শিকার-কাহিনী বেশ ফলাও করে কাগজে ছাপা হয়! ফলে, আমরা প্রসিদ্ধি লাভ করি!

কিন্তু এরা কি করলো দেখেছ? আজ প্রমাণিত হলো যে, সুসভ্য ইংরেজ শিকারীর চেয়ে এইসব অসভ্য শিকারীরা ঢের বেশী সাহসী!

কেউ কারও ভাষা বুঝিনে। অন্যের মারফৎ মনের কথা জানাতে হয়। তা নইলে আজ ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি ওদের সাথেই গল্প করতুম!"

অন্য সঙ্গীরাও সাহেবের কথায়ই সায় দিলে।

সন্ধ্যা তখন তার অন্ধকার কালোছায়া মেলে সারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে! আমরা এখন আরও জোরে পা চালিয়ে দিয়েছি।

কারণ, একে তো আফ্রিকার জঙ্গল—যেখানে পায়ে পায়ে বিপদ্ জড়িয়ে আছে, তায় আবার অন্ধকার! সে যে কী ভীষণ, তা কল্পনা করাও কঠিন। কাজেই নিরাপদ্ আশ্রয়ের আশায় আমরা তখন খুবই তাড়াতাড়ি হাঁটছি!

তবু তারই মাঝে যতটুকু সতর্কতা নেওয়া সম্ভব, সেটুকু নিতে আমরা কিছুমাত্র ক্রুটী করি নাই। কারণ, বাঘ, সিংহ, হাতী এসব দেখা গেলেও লিক্‌লিকে সরু বিষাক্ত সাপগুলো তো সব সময় চোখে পড়ে না!

জঙ্গল মাড়িয়ে চলছি—পায়ের তলায় কত লতাপাতা বুনো ঝোপ পেবাই হয়ে যাচ্ছে, তাদের মাঝে যে কোন সাপ লুকিয়ে নেই,

কে তা বলবে? অথচ তাড়াতাড়ি আমাদের হাঁটতেই হবে—নিতান্ত প্রাণের তাগিদে।

কিন্তু ছোট বড় সাপের ভয়টাকেও তো অস্বীকার করা যায় না! তাই মাঝে মাঝে হাঁটি, আর কখনো বা ওপরে নীচে টর্চ্চের আলো ফেলে গুপ্ত শত্রু কেউ আছে কিনা দেখে নিই।

এমনি ভাবেই আমরা চলছিলাম। হঠাৎ অদূরেই কোথায় কারা ভয়ার্ত্ত চীৎকার করে উঠলো!

চীৎকারের সঙ্গে ভাষা একটা কিছু ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু আমরা তা বুঝতে পারলুম না। কারণ, সে দেশীয় ভাষায় কারা চীৎকার করে উঠেছিল! আমাদের মুটেরা বললে, "সাহেব! কারা যেন বাঘের হাতে প্রাণ হারালো।"

কথাটা শুনে আমরা শিউরে উঠলুম, আর বিপন্ন হতভাগাদের জন্য মনটা কেঁদে উঠলো। আমি বললাম, "ওদের বলো না এদিকে ছুটে আসতে! দেখা যাক্, তবু যদি বাঁচানো যায়!"

সাহেবরা এরই মাঝে কয়েকবার বন্দুকের আওয়াজ করলেন। উদ্দেশ্য, বাঘ যেন ভয়ে পালিয়ে যায়, আর লোকগুলো যেন শব্দ শুনে এদিকে ছুটে আসে!

উদ্দেশ্য তাঁদের ব্যর্থ হলো না। হঠাৎ আবার কয়েকটি চীৎকার, ও সঙ্গে সঙ্গে কারা যেন এদিকে ছুটে আসছে স্পষ্ট বোঝা গেল। আমরা তখন আমাদের সব কটি টর্চ্চের আলো ইতস্ততঃ ফেলতে সুরু করে দিয়েছি!

মুহূর্ত্ত মধ্যেই আমাদের কাছে ছুটে এলো দুটি লোক। আর এসেই চোখের পলকে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো!

আমার সাহেব তৎক্ষণাৎ আদেশ করলেন, "ঝন্টু, তোমরা কয়েকজন টর্চের আলো ফেলে, রাইফেল নিয়ে তৈরী থাকো; পাহারা দাও হঠাৎ যেন কোন বিপদ্ না আসে! আমরা ততক্ষণ এদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করি।"

তাঁর কথামত আমরা তৈরী হয়ে রইলাম। কিন্তু লোক দুটোর দিকে চোখ পড়তে আমরা তো বিস্ময়ে অবাক্!

একি! এরা কী রকম মানুষ? শিশুর মতো ছোট্ট দেখতে—তিন ফুটের বেশী উঁচু নয়; কিন্তু শিশু যে নয়, তা স্পস্টই বুঝতে পারা যায়।

আমাদের বিস্ময় দেখে, আমাদের মজুররা বললে, "আফ্রিকায় এরকম মানুষও বাস করে। এদের বলা হয় 'পিগ্‌মী' বা 'বামন'। সংখ্যায় এরা খুব বেশী নয়। এরা খুবই শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ। নিতান্ত দায়ে না পড়লে, এরা কখনো কোন ঝগড়া-বিবাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় যায় না।"

খুবই কৌতূহল হলো কথাটা শুনে! বেশ লক্ষ্য করে ও ভাল করেই ওদের দেখলুম। সুস্থ হওয়ার পরে ওদের একখানি ফটোও নেওয়া হয়েছিল দেশে ফিরে এসে সকলকে দেখাবার জন্য।

তারপর জ্ঞান যখন ফিরে এলো তখন তাদের জিজ্ঞেস করা হলো কী হয়েছিল ব্যাপারটা।

ওরা বললে যে, ওরা এদিকে এসেছিল অন্য এক দেশে যাওয়ার পথে। বেরিয়েছিল ওরা তিনজন। কিন্তু এক সিংহ ওদের একজনকে মুখে করে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

আমার সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "সে হলো কবেকার ঘটনা?"

একটি বামন বললো, " 'কবেকার' কি বলছেন? এ যে

আজকেরই ঘটনা—দুপুরের দিকে বা তার একটু পরে ঘটেছিল। কোথা থেকে ছুটে এলো এক বিরাট হিংস্র সিংহ। তার পেছনে কোথায় খুব হৈ-হল্লা সুরু হয়েছিল! সম্ভবতঃ কোথায়ও তাড়া খেয়ে ছুটে পালাচ্ছিল। পথিমধ্যে পেয়ে গেল আমাদের সাথীটিকে।

ব্যস্, আর কি? এক লাফে তাকে ধরে নিয়ে, কাঁধে ফেলে দে ছুট।"

"সে তো হলো একজনের কথা! কিন্তু তোমরা ছুটছিলে কেন? চেঁচালেই বা কেন?" জিজ্ঞেস করলেন এক সাহেব।

বামন বললো, "সঙ্গীকে বিসর্জ্জন দিয়ে, মনের ব্যথায় কিছুটা অভিভূত ভাবেই আমরা হাঁটছিলাম। হঠাৎ এক সময় চেয়ে দেখি, পথের এক পাশে একটা চিতাবাঘ দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের লক্ষ্য করছে। তার উদ্দেশ্য আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়া। যেমনি দেখা, তখনই 'বাঘ, বাঘ' বলে ছুটতে শুরু করেছিলাম।"

এক শিকারী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু সে বাঘ এখন কোথায়?"

"সে খবর তো বলতে পারবো না।" বামন চট্‌পট্ উত্তর দিলে।

ঠিক্ এমনি সময় ওদের প্রায় মাথার ওপর এক গাছের ডাল একটু নড়ে উঠলো। ডালের দোলা ও পাতার সড়্‌সড়ানি মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করলো। আমরা সবাই—প্রায় একই সঙ্গে ওপর দিকে তাকালুম।

স্পষ্ট বোঝা গেল না! কি ঐ জিনিসটা। তবে, একটা কিছু জিনিস যে ওপরে রয়েছে, এ বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ রইলো না।

টর্চ্চ লাইটের তীব্র আলোকে ওপরের জিনিসটা যেন একবার

নড়ে চড়ে উঠলো আর একটু গোঁগোঁ করে তার প্রতিবাদ ঘোষণা করলো।

আবার একঝলক আলো। আলোয় আলোময় হয়ে উঠলো সব কিছু !

এবার আর কারও বুঝতে বাকি রইলো না যে জিনিসটা কি ! বামন-গুলো একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলো, "ঐ তো, ঐ যে সেই চিতাবাঘ!—"

প্রায় একই সঙ্গে গর্জ্জন করে উঠলো সব কয়টি রাইফেল ! সঙ্গে সঙ্গে বুলেটে শতছিদ্র ঝাঁঝরা হয়ে চিতাবাঘটি গাছ থেকে পড়লো !

পতনের শব্দে এগিয়ে গেলাম সবাই। কিন্তু তখন আর দেহে তার বিন্দুমাত্র প্রাণের চিহ্ন নাই !

কি ধূর্ত্ত এই চিতাবাঘগুলো ! বনের অন্ধকারে নিঃশব্দে চলাফেরা করে শিকার আক্রমণ করে। শুকনো পাতার ওপর দিয়েও এরা কেমন চুপি চুপি হেঁটে যায় ! চোখে ধরা না পড়লে, সাধ্য কি কেউ এদের চলাফেরা টের পায় !

বামনদের নিয়ে আমরা যখন ব্যস্ত ছিলাম, আর কথা কইছিলাম তাদের আক্রমণকারী চিতাবাঘ সম্পর্কে, তখন যে সেই চিতাবাঘই চুপি চুপি আমাদের মাথার ওপর বসে, নতুন করে আক্রমণের ফন্দি করছিল, তা কেমন করে বুঝবো ?

ধরা হয়তো সে পড়তো না, সম্ভবতঃ তার নিতান্ত ভাগ্যদোষেই তাকে দেখে ফেলেছিলাম ! কিন্তু যদি কোন-রকমে সে এড়িয়ে যেতে পারতো, তা হলে কী যে সাঙ্ঘাতিক ফল হতো, তা ভাবতেই আমরা শিউরে উঠলাম !

যাহোক, পুনঃ পুনঃ বিপদের মুখে পড়ে, দুশ্চিন্তা ও অতিরিক্ত

পরিশ্রমে আমরা তখন হাঁপিয়ে উঠেছি। আর এক পা চলি, এমন শক্তিও কারও ছিল না। কাজেই স্থির হলো, রাতের অন্ধকারে, আর কোথাও গিয়ে কাজ নেই। আজ রাতটার মত সেইখানে বিশ্রাম করাই হলো সকলের অভিপ্রায়।

সাহেবের কথামত আমরা সকলেই সেই গাছের ওপর চড়ে বসলাম। খানিক আগে যে ডালটা ছিল চিতাবাঘের মাচান, তাইই এখন আমাদের আশ্রয়ে পরিণত হলো।

তারপর গাছটাকে ঘিরে, কিছুদূর গিয়ে মণ্ডলাকারে একটা অগ্নিকুণ্ড সাজানো হলো। আমাদের কুলিরা ও সেই পিগ্‌মী দুজন অতি আনন্দের সঙ্গে গাছতলায় বসে সেই অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রাখতে ব্যস্ত রইলো!

শিকারী সাহেবরা মাঝে মাঝে দু'একটি ফাঁকা আওয়াজে আমাদের অস্তিত্ব জানিয়ে দিচ্ছিলেন। সারারাত এই ভাবেই চললো আমাদের রাতের মহড়া!

কিন্তু রাত তো চিরকাল থাকে না। রাতের অন্ধকার এক সময় কেটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভোরের আলো পৃথিবীর বুকে হাসির ছোঁয়াচ লাগিয়ে দেয়। আমরাও সেইভাবে একসময় রাত কাটিয়ে দিনের আলোয় চোখ মেলে তাকাই।

ভোরের আলোয় মানুষের আশা-ভরসা জেগে ওঠে,—বিপদের কথা, দুঃখের কথা মানুষ স্বভাবতঃই ভুলতে সুরু করে। আমাদেরও মনে হলো, আর বুঝি কোন বাধা-বিঘ্ন নেই, আফ্রিকার বিভীষিকা আমাদের চোখ থেকে দূরে সরে যায়!

দূরে কোথায় যেন একটা মৃদু বাজনা শোনা যায়—একটানা, একসুরে।

নূপুরের মত বেজে উঠেছিল ! কিন্তু যতই সে স্পষ্ট থেকে অধিকতর স্পষ্ট হয়, ততই যেন বলির সন্ধিক্ষণ উপস্থিত হলো বলে মনে হতে থাকে !

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ দূর হতে ঢাক ঢোলের শব্দ আর হৈ হৈ চীৎকার আরও স্পষ্ট হয়ে আমাদের কানে আসে। মনে হয় যেন অনেকগুলো লোক ঢোল বাজাতে বাজাতে এই দিকে আসছে।

আমি মানুষের সমাগম আশা করে আনন্দ প্রকাশ করতে যাচ্ছিলাম ! কিন্তু সাহেবের মুখ শুকিয়ে একেবারে এতটুকু হয়ে গেল। আমি তার কারণ বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের পানে চাইতেই তিনি চুপি চুপি বললেন—"Savages" অর্থাৎ নরখাদক অসভ্যেরা। শুনে আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। এই নানা বিপদ, আবার তার উপর রাক্ষস ? তবে আর বাঁচবার কোনো আশা নেই।

গোলমাল ক্রমেই নিকটে আসতে লাগলো। দেখলাম নীচে জলহস্তীগুলো সেই গোলমালের শব্দ শুনে পালিয়ে গেল।

তাদের পালাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় পঞ্চাশজন নরখাদক অসভ্য ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে সেখানে এসে হাজির। তাদের আকার দেখেই আমাদের চক্ষুস্থির। মাথায় এক এক রাশ রুক্ষ ঝাকড়া চুল, তা আবার লতা দিয়ে ঝুঁটি করে বাঁধা। গলায়, হাতে, কোমরে হাড়ের মালা আর গয়না ; কারও কারও গলায় মানুষের মড়ার মাথা। কোমরে কাপড় নেই। একদম উলঙ্গ। হাতে তীর, ধনুক, বর্শা, আর বাঁশের অস্ত্র-শস্ত্র। তাদের গায়ের রঙের কাছে আলকাতরাও হার মেনে যায়। গোল গোল ভাটার মত চোখ, থ্যাবড়ানো চাওড়া নাক, ওল্টানো বেজায় পুরু ঠোঁট। তার উপর আবার তাদের প্রত্যেকের মাথায় শকুন আর চিলের পাখার ঘেরাটোপ।

তারা সব হৈ হৈ করতে করতে গাছের তলায় এসেই উপর পানে চেয়ে আমাদের দুজনকে দেখে ফেললে। বুঝলাম এইবার সত্য সত্যই আমাদের শেষ।

অসভ্যদের যে সর্দ্দার তার চেহারা আরো বিশ্রী। তাকে দেখলে সত্যই রাক্ষস বলে মনে হয়। তার গলায় একটা মড়ার আস্ত মাথা ঝুলছে, আর মাথায় কোমরে শকুনের পালকের কি ঘটা! সে একটা কি অবোধ্য ভাষায় হুকুম করলে আর সঙ্গে সঙ্গে দুজন লোক বর্শা নিয়ে গাছের উপর উঠতে লাগলো! আরও কয়েকজন ধনুকে তীর পরিয়ে আমাদের দিকে তাগ করতে লাগলো। ভাবলুম বুঝি মেরে ফেললে। কিন্তু তারা তীর ছাড়লে না। শুধু আমাদের ভয় দেখাবার জন্যে তীর উঁচু করে ধরে রইলো।

আমাদের দুজনকে গাছ হতে নামিয়ে নিয়ে ফিরে যাবার সময় তারা পূর্ব্বের মত ঢোল বাজাতে বাজাতে চলতে লাগলো। আমরা বলিদানের ছাগলের মত কাঁপতে কাঁপতে তাদের সঙ্গে চললাম।

অসভ্য নরখাদকেরা যখন আমাদের ধরে নিয়ে চললো—তখন আমাদের পরিণাম যে কি হতে পারে তা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। তারা আমাদের জীবন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে আমাদের গায়ের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে তা বুঝেও আমরা জীবনের আশা ছাড়ি নি। উপস্থিত কোন কিছু করতে গেলে বিপদ আরও সুনিশ্চিত জেনে আমরা শুধু উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করছিলাম। সুযোগ পেলেই আমরা আত্মরক্ষার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো, এ কথা আমরা ভেবে রেখেছিলাম! কাছে যতক্ষণ রাইফেল আছে ততক্ষণ কিসের ভয়? আর যদি নিতান্তই মরতে হয় তা হলে

কাপুরুষের মত মরব না নিশ্চয়। রাক্ষসদের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করতে করতে মানুষের মতই মরবো।

কলের পুতুলের মত নরখাদকদের সঙ্গে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে সাহেবের সঙ্গে দু'একটা কথা কয়ে যুক্তি আটছি। বুনোরা আমাদের ভাষা বোঝে না। কাজেই কোন অসুবিধা নেই। তবে মাঝে মাঝে দু'একজন অসভ্য আমাদের পিঠে দু'একটা গুঁতো মেরে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এমনি করে অনেক বন জঙ্গল ভেঙে তারা আমাদের নিয়ে গেল তাদের ডেরায়।

আমরা যখন সেখানে পৌঁছুলাম তখন কতকগুলি অসভ্য নর ও নারী উঠানে জটলা পাকাচ্ছিল। আমাদের দু'জনকে দেখে তাদের কি আনন্দ।

নারীদের মধ্যে দু'তিন জন আমাদের গা টিপে দেখতে লাগলো যে আমাদের গায়ে কতখানি মাংস আছে, আর তা নরম কি শক্ত। তারপর তারা হি হি হি হি করে অট্টহাসি হাসতে লাগলো।

গায়ের রক্ত যেন জল হয়ে গেল। বাপরে। কি ভয়ানক তাদের চেহারা। আর কি বিকট হাসি!

কজন রাক্ষস আর রাক্ষসী মিলে আমাদের একটা কুঁড়ের সুমুখে জোর করে বসালে। তারপর দশ বারো জন রাক্ষস আমাদের ঘিরে বসলো। ঠিক পিছনেই একটা উঁচু পাথরের উপর সর্দ্দার বসে পড়লো। আমাদের পাশেই দুটো প্রকাণ্ড জন্তু আগুনে পোড়ান হচ্ছিলো। তারা সে দুটোকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে মহা আনন্দে খেতে লাগলো।

খাওয়ার পর নাচ। উঠানের মাঝখানে তারা সবাই মিলে



ঢোল মাদল বাজিয়ে তাণ্ডব নৃত্য লাগিয়ে দিলে। তাদের সেই অদ্ভুত নৃত্য, আর মধ্যে মধ্যে রে রে—হৈ হৈ শব্দ শুনে আমাদের তাক্ লেগে গেল।

আমরা যেখানে বসে নাচ দেখছি তার চার পাশে দশ বারো জন আমাদের ঘিরে বসে আছে। আমাদের দিকে তাদের কড়া নজর। কাজেই কোন কিছু করবার সুযোগ পাচ্ছি না। কিন্তু যা হয় একটা কিছু করতে হবে। নইলে আমাদের দশা যে কি হবে তা বুঝতেই পারছি।

সর্দ্দার আমাদের পিছনে বসে আছে। সে কেবল মাঝে মাঝে কটমট করে আমাদের দিকে চাইছে, আর আমাদের গলা শুকিয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে বুঝি এখনই আমাদের খেয়ে ফেলে। তবু আমরা চুপ করে বসে উদ্ধারের উপায় চিন্তা করছি।

হঠাৎ এক বেটা কৌতূহল পরবশ হয়ে আমার হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিলে। সেটা কি জিনিস তা সে জানে না। শুধু সে কেন? তাদের কেউই জানে না যে এটা কতো বড় মারাত্মক অস্ত্র। তাই সে রাইফেলটা নিয়ে নেড়ে চেড়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটা দেখতে লাগলো।

রাইফেলের নলটা সর্দ্দারের দিকে ফেরানো ছিল। সর্দ্দারটাও কৌতূহলের সঙ্গে রাইফেলটার দিকে চেয়ে ছিল। এটা ওটা নাড়তে নাড়তে বুনোটা খট্ করে ঘোড়াটা তুলে ফেললে। তারপর ক্রমে ক্রমে এটা সেটায় হাত দিতে দিতে হঠাৎ ট্রিগারটা ধরে টান দিলে।

আর যাবি কোথা? রাইফেলে গুলি ভরা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ হয়ে একেবারে গুলি গিয়ে বিঁধলো সর্দ্দার বেটার বুকে।

এই আকস্মিক ব্যাপারে সকলে মহা ভয় পেয়ে গেল। যে ব্যাটা রাইফেল ঘাঁটছিলো সে তো চমকে উঠে রাইফেলটা আমার কোলে ফেলে দিয়ে ছুটে বাইরে পালিয়ে গেল। সকলে বোধ হয় ভাবলে যে এটা একটা বাজ। নইলে হঠাৎ আগুনের হলকা আর এমন শব্দ হয়? আর তাইতে সর্দ্দার তখনি মরে যায়? তারা প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল। তারপর সকলে মিলে সেই লোকটাকে ধরে টানাটানি করতে লাগলো, যে বাজ টেনে এনে সর্দ্দারকে মেরে ফেলেছে। একটা মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। সবাই উঠানের মাঝখানে জমা হয়ে সেই লোকটাকে ধরে বেদম ঠেঙাতে সুরু করে দিলে।

আমরা দেখলাম এই মহা সুযোগ। আমাদের দিকে তাদের তখন লক্ষ্য নেই। তারা সেই লোকটাকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সর্দ্দারকে হত্যা করবার প্রতিশোধ নিতেই তারা উন্মত্ত। অবসর বুঝে আমরা রাইফেল দুটো হাতে নিয়ে কুঁড়ের পাশ দিয়ে সরে পড়লাম। তারপর দুজনে বন জঙ্গল ভেঙ্গে, পড়ি কি মরি করতে করতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটলাম।

চারশো হাত যেতে না যেতেই পিছনে শুনলাম অসভ্য বেটাদের গোলমাল। তারা সকলে দল বেঁধে তীর, ধনুক নিয়ে আমাদের দিকে আসছে। আমরা তো কোনও দিকে না চেয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ছুটতে লাগলাম। অসভ্যেরা পিছন হতে তীর ছুঁড়তে

লাগলো দু'একটা তীর আমার কানের পাশ দিয়ে সোঁ সোঁ করে বেরিয়ে গেল। সাহেবের হাতের রাইফেলটির কুঁদোতে ঠক্ করে একটা তীর এসে লাগলো। আর একটু হলেই সাহেবকে বিঁধেছিল আর কি! সে তীর গায়ে বিঁধলে কি আর রক্ষা ছিলো? তীরের ফলায় বিষ মাখানো। সে বিষ রক্তের সঙ্গে মিশলে মৃত্যু সুনিশ্চয়। দেখলাম ব্যাপার বড় সুবিধার নয়। এমনভাবে ছুটলে রাক্ষসদের হাত হতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। আমরা একটা আশ্রয়ের আশায় চারিদিকে চাইতে চাইতে ছুটতে লাগলাম।

পথের একটু দক্ষিণে একটা প্রকাণ্ড পাথর পড়েছিল। পাথরটা হাত দুই উঁচু আর প্রায় পাঁচ হাত লম্বা। তার পিছনে গুঁড়ি মেরে বেশ আত্মগোপন করা যেতে পারে। আমরা কালবিলম্ব না করে তার আড়ালে গিয়ে বসলাম। তারপর পাথরটার উপর রাইফেলের নল দুটি রেখে অসভ্য বেটাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিলাম।

গুড়ুম, গুড়ুম, গুম্ আমাদের রাইফেল গজরাতে লাগলো আর দূরে, এক একটা রাক্ষস ছুটতে ছুটতে ঘুরে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে লাগলো। তাদের তীরগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পাথরটার উপর বা আশে পাশে পড়তে লাগলো। কোনটা বা আমাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গেল। সেদিকে আমাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। আমরা কেবল অবিশ্রাম গুলি চালাতে শুরু করলাম।

রাক্ষসদেরও জেদ কম নয়। দলের লোক কতকগুলো মরলো দেখেও প্রথমটা তারা ভয় পেলে না। আমাদের ঘাড়ে এসে পড়বার চেষ্টা করতে লাগলো। আমরা তখন মরিয়া।

সত্য কথা বলতে কি আমার তো তখন রক্ত গরম হয়ে উঠেছে।

নিজের মরণ বাঁচনের কথা তখন আর মনে নেই। কেবলই গুলি চালাচ্ছি।

রাইফেলের ধোঁয়ায় যেন কুয়াশার সৃষ্টি হয়ে গেল। যে রাক্ষসগুলো এগিয়ে আসছিলো তারা মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলো।

তখন রাক্ষসেরা তাদের অবস্থা বুঝতে পারলে। এ রকম ভাবে আর কিছুক্ষণ যুদ্ধ চললে তাদের প্রকাণ্ড দলের একটা প্রাণীও যে বেঁচে থাকবে না, তা তারা বেশ বুঝে নিলে। তখন যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে তারা পালাতে সুরু করলে।

আমি আর ধৈর্য্য রাখতে পারলাম না। এত বড় একটা যুদ্ধ জয় করে আমার শরীর আগুন হয়ে গিয়েছে। রাক্ষসদের পালাতে দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। পাথরের আড়াল হতে ছুটে বেরিয়ে মার্ মার্ বলতে বলতে তাদের পিছনে তাড়া করলাম। সাহেব আমাকে তেমন কাজ করতে নিষেধ করলেন! সে কথা আমার কানে গেল না। আমি রাক্ষসদের পিছনে ছুটতে লাগলাম।

ফাঁকা জায়গায় আমাকে একা এগুতে দেখে হঠাৎ অসভ্যেরা আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে প্রতিশোধ নেবার আশায় আমার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছাড়তে লাগলো। বিশটা তীর আমার সুমুখে আর আশে পাশে এসে পড়লো আর দু তিনটে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

সাহেব পিছন পিছন ছুটে আসতে আসতে চেঁচিয়ে বললেন—"শুয়ে পড়ো, শীগ্‌গির শুয়ে পড়ো।" আমি আর এক সেকেণ্ড

দেরী না করে, ধপ্ করে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো বিষাক্ত তীর আমার উপর দিয়ে সাঁ সাঁ করে ছুটে চলে গেলো।

ঠিক সেই সময়ে আমার পিছনে হাঁটু গেড়ে বসে সাহেব গুলি চালাতে লাগলেন। আমিও শুয়ে শুয়ে গুলি করলাম। দেখতে দেখতে আরও তিন চারটে বুনো সাবাড় হলো। তখন নিতান্ত বেগতিক বুঝে আক্রমণের সব আশা ছেড়ে দিয়ে, বুনোরা প্রাণভয়ে যে যেদিকে পারলে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

সাহেব আমাকে একচোট খুব ধমকালেন। নিজের আশ্রয় ছেড়ে দিয়ে অসভ্যদের সুমুখে এমন আহাম্মুকের মত দৌড়ে আসা আমার পক্ষে যে খুবই মূর্খতার কাজ হয়েছে তা তিনি আমায় বুঝিয়ে দিলেন। আমিও তা বুঝে খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম।

যুদ্ধে জয় হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের সমস্যা যেমন তেমনিই রয়ে গেল। আমরা এসেছি কোথায় কতদূরে তার ঠিক নেই। কোন্ দিকে আমাদের তাঁবু, কোন্ দিকে বোট্ তা কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

এখন উপায়? আফ্রিকার জঙ্গল। সাক্ষাৎ যমের রাজত্ব। পদে পদে একটা না একটা জানোয়ারের সুমুখে পড়ার ভয়। নরখাদক অসভ্যদের তো কথাই নেই।

সুমুখে রাত আসছে। একটি পা বাড়াবার উপায় থাকবে না। পা বাড়ালেই মরণ সুনিশ্চয়। এখানে জলে, স্থলে, গাছে, কোথাও আশ্রয় নেই। কোন স্থানই নিরাপদ নয়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব কথা ভাবছি এমন সময় সাহেব বললেন

—"দেখ, এমন করে নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ফল নেই। এসো একটা কাজ করা যাক্।

আমি হিসাব করে দেখলাম যে আমরা আমাদের তাঁবু হতে বরাবর দক্ষিণ পশ্চিমে এসেছি। বোট্ হতে আমরা এসেছি পশ্চিমে। আর বোটের কাছ হতে আমরা যে খুব বেশী দূর এসেছি তা নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এখান হতে বরাবর পূর্ব্বে আন্দাজ তিন চার মাইলের মধ্যে আমাদের বোট্ আছে। যদি ক্রমাগত পূব দিকে ছুটতে থাকি তা হলে বড় জোর এক ঘণ্টার মধ্যে বোটের কাছে পৌঁছতে পারবো।

এখন বেলা চারটে। সন্ধ্যা হতে এখনও দেড় ঘণ্টা বিলম্ব আছে! তাহলে হয়তো সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমরা বোটে পৌঁছতে পারি। না পারি, তাতেই বা ক্ষতি কি? এখানেও যে অবস্থা সেখানেও তাই। তবু তো মানুষের মত চেষ্টা করা হবে?"

সাহেবের কথা আমার খুব মনে লাগলো। ঠিকই তো। চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? এখানে দাঁড়িয়ে মরার চেয়ে চেষ্টা করতে করতে মরা ঢের ভালো।

আমরা আর সময় নষ্ট করলাম না। বন জঙ্গল ভেঙে বরাবর পূর্ব্ব দিক লক্ষ্য করে ছুটতে লাগলাম।

কিছুদূর যাবার পর একটা ভয়ানক শব্দ আমাদের কানে গেল: সে কি ভীষণ আওয়াজ! চারদিকের বন-জঙ্গল যেন সেই শব্দে কাঁপতে লাগলো। আমরাও ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। আমাদের পা দুটো এমন ভারী হয়ে গেল যে আমরা যেন আর তাদের তুলতে পারছিলাম না। সভয়ে চারদিকে চাইতে চাইতে একটুখানি

এগিয়ে যেতেই সেই শব্দের কারণ আমাদের চোখে পড়ে গেল। কি ভয়ানক ব্যাপার !

সেই স্থান হতে তিনশো হাত দূরে একটা জলা। তার তীরে একটা প্রকাণ্ড সিংহের সঙ্গে একদল বুনো মোষের ভয়ানক লড়াই বেধে গিয়েছে। বুঝলাম সিংহ মহারাজ বোধহয় পেটের জ্বালায় তাদের মধ্যে একটাকে আক্রমণ করেছিলেন। তার ফলেই এই যুদ্ধ।

দেখলাম বুনো মোষেরা রেগে আগুন হয়ে ভীষণ ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে করতে ঘাড় নিচু করে চারদিক হতে সিংহকে আক্রমণ করছে, আর সিংহটাও মেঘ গর্জ্জনের মত আওয়াজ ছাড়তে ছাড়তে ভীষণ থাবা আর দাঁতের সাহায্যে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। দু পক্ষেরই সমান জেদ। কোন পক্ষই হার মানতে প্রস্তুত নয়। তাদের ভীষণ দাপাদাপি আর গর্জ্জনে জঙ্গলের সে অঞ্চলটা একেবারে মুখরিত হয়ে উঠেছে।

দৃশ্যটা লোমহর্ষণকর হলেও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখবার কৌতূহল দমন করতে পারলাম না! সিংহের থাবায় এক এক করে পাঁচ ছ'টা মোষ ধরাশায়ী হলো। কিন্তু দুর্দ্দান্ত মোষেরা তাতে ভয় পেল না। তারা আরও উন্মত্ত হয়ে বাঁকা বাঁকা শিঙের সাহায্যে পশুরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলো। ক্রমে সিংহ মহারাজ ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর আস্ফালন আর গর্জ্জন ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগলো। তবুও সেই অবস্থায় তিনি আরও তিন চারটে শত্রুকে নিহত করলেন। তারপর বীরের মত ক্ষিপ্ত মোষদের শিঙের গুঁতোয় পঞ্চত্ব লাভ করলেন।

আমরা তো ভয়ে একটা ঘাসের ঝোপের আড়ালে লুকোবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমাদের সে উদ্দেশ্য সফল হলো না। একটা মহিষ আমাদের দেখে ফেললে। বিষম বেগতিক দেখে আমরাও পড়ি কি মরি করতে করতে খালের ধারের সেই গাছটার দিকে ছুটলাম।

গাছটার প্রায় বিশ হাতের মধ্যে এসেছি এমন সময় পিছনে ভীষণ ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে ফিরে দেখলাম দুটো মহিষ আমাদের ঠিক পিছনেই এসে পড়েছে। নিরুপায় হয়ে তাড়াতাড়ি সে দুটোকে গুলি করলাম। তারপর আবার ছুট।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই গাছটার তলায় পেঁছে লাফ দিয়ে ঝুরিটা ধরে ওপারে লাফিয়ে পড়লাম। এপারে এসে আর অপেক্ষা করতে পারলাম না।

এখনো আমাদের সুমুখে অনেক পথ পড়ে রয়েছে। দুই শাখার সংযোগ স্থলে ত্রিমোহনার মুখে আমাদের বোট রেখে এসেছি। সেস্থান এখনও দেড় মাইল দূরে।

এদিকে সন্ধ্যা এসে পড়েছে। এখনই গাঢ় অন্ধকার হয়ে পড়বে। তখন আর পথ চিনে চলতে পারবো না।

অগত্যা আমরা আবার পূর্ব্বের মত ছুটতে লাগলাম।

বিশ মিনিটের মধ্যেই ত্রিমোহনার খুব কাছে এসে একটু দূরে তিনজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। নিকটে যেতেই চিনলাম তাদের মধ্যে একজন আমাদের শিকার-সঙ্গী ইউগ্যাণ্ডার সাহেব, আর দুজন আমাদের কুলি। তিনি প্রায় আধঘণ্টা পূর্ব্বে

সেখানে হাজির হয়েছেন। কিন্তু আমাদের এখানে না পেয়ে বোটে ওঠেন নি।

শুনলাম বুনো হাতীর দল তিনজন কুলিকে ধরে একেবারে মাংসের তাল করে ফেলেছে। সাহেব, আর এই দুজন কুলিকেও তারা ধরে ফেলতো যদি না তাঁরা একটা জানোয়ার ধরা গর্ত্তের মধ্যে পড়ে যেতেন।

এ অঞ্চলের অসভ্যেরাই বোধ হয় সেই গর্ত্ত কেটে রেখেছিল। গর্ত্তটি লম্বায় ৫ হাত, চওড়ায়ও প্রায় হাত তিন। আর সেটা গভীর প্রায় আট হাত। গর্ত্তটির চারপাশ হতে লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে গর্ত্তটিকে একেবারে ঢেকে ফেলেছিল। উপর হতে বোঝবার কোনও উপায় ছিল না।

এঁরা তিনজনে ছুটতে ছুটতে হুড়মুড় করে তার মধ্যে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে ঘাসগুলো যেমন গর্ত্তটিকে ঢেকে রেখেছিল, তেমনি ঢেকে ফেলে। হাতীগুলো তাঁদের আর দেখতে না পেয়ে অন্যদিকে চলে যায়। তিন চার ঘণ্টা তাঁরা হাতীদের ভয়ে সেই গর্ত্তের মধ্যেই লুকিয়ে থাকেন। তারপর অনেক কষ্টে, উপরে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এখানে এসেছেন। সাহেবের ডান পাটি খুবই জখম হয়েছে। বোধ হয় সেটা কেটে বাদ দিতেই হয়।

যা হোক আর বিলম্ব না করে আমরা বোটের কাছে গেলাম। দেখলাম দুটো প্রকাণ্ড কুমীর তার ভিতর মজা করে শুয়ে রয়েছে। রীতিমত খোঁচা দিতে তবে তারা বোট ছেড়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমাদের শিকার করা সিংহ দুটি বোটে নেই। কুমীর মশায়দের পেটে চলে গিয়েছে।

বোট নিয়ে তাড়াতাড়ি আমরা বেরিয়ে পড়লাম। তখন রীতিমত

অন্ধকার। তিন ঘণ্টা পরে আমরা তাঁবুর কাছে এলাম। বোটে বসে পাঁচ-ছ বার রাইফেলের আওয়াজ করবার পর তাঁবু হতে একদল কুলি আর দুজন সাহেব অনেকগুলো জ্বলন্ত মশাল নিয়ে নদীর তীরে নেমে এলেন। তাঁদের সঙ্গে আমরা তাঁবুতে চললাম।

তাবুতে এসে শুনলাম প্রায় বিশ পঁচিশটা নরখাদক অসভ্য তাঁবু আক্রমণ করেছিলো কিন্তু সাহেব দুজনের গুলি খেয়ে তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ আশপাশেই পড়ে আছে। মাত্র তিন চারজন প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছে।

সে রাত্রে আর অধিক আলাপ করা গেল না। আমরা সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কোন রকমে কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ভোরে উঠে সকলে মিলে নরখাদকদের মৃতদেহগুলো দেখতে পেলাম। তাঁবুর নিকটে ও কিছু দূরে কুড়িটা মৃতদেহ পড়ে ছিল।

নরখাদক অসভ্যদের মৃত্যু দেখে আমাদের খুব আনন্দ হলো। তারপর আমরা তাঁবুতে ফিরে এলাম। আমরা সকলেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই আর শিকারের চেষ্টা না করে ইউগ্যাণ্ডায় ফিরে যাবার মতলব করলাম।

সাহেব বললেন, "এসব জন্তু শিকারে তেমন মজা নেই। শিকার যদি করতে হয় তো গরিলা। গরিলার মত ভয়ঙ্কর জীব আর পৃথিবীতে নেই। সিংহ, বাঘ, গণ্ডার, হাতী, সব জানোয়ারই গরিলাকে যমের মত ভয় করে।

ঠিক হল এবার আমরা গরিলা শিকার করবো। কিন্তু গরিলা এ অঞ্চলে থাকে না। আমরা ইউগ্যাণ্ডায় দিন কয়েক বিশ্রাম করে তারপর গরিলা শিকারে যাব।

পরামর্শ মত তখনই তাঁবু ওঠাবার জন্যে কুলিদের হুকুম দেওয়া হলো। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই যাত্রার সব ঠিক হয়ে গেল। যে সাহেবটির পায়ে আঘাত লেগেছিল, তাঁকে ডুলিতে বসিয়ে নিয়ে আমরা সদলবলে ইউগ্যাণ্ডা অভিমুখে যাত্রা করলাম।

ইউগ্যাণ্ডায় পৌঁছে দুই সপ্তাহ বিশ্রাম করলাম। তারপর সব আয়োজন ঠিক করে নিয়ে আমরা গরিলা শিকারে যাত্রা করলাম।

ইউগ্যাণ্ডার পশ্চিমে আলবার্ট নায়েঞ্জা নামে একটা প্রকাণ্ড হ্রদ আছে। সেই হ্রদ থেকে একটি শাখানদী বেরিয়ে বরাবর বেলজিয়ান কঙ্গোর মাঝামাঝি স্থানে কঙ্গো নদীর সঙ্গে মিশেছে। প্রকৃতপক্ষে এটি কঙ্গোরই এমটি শাখা। এই নদীর দুইপাশে গভীর জঙ্গল।

আফ্রিকার এই অঞ্চলে খুব বেশী বৃষ্টি পড়ে তাই জঙ্গল এখানে এত বেশী। এই সব জঙ্গল এত গভীর যে দিনের আলো তার মধ্যে ঢুকতে পারে না। তাই দিন দুপুরেও তার মধ্যে অন্ধকার।

এসব জঙ্গলে ঘাস নেই। জিরাফ, জেব্রা, হরিণ, মোষ, হাতী, এক কথায় কোন তৃণভোজী জীবই এখানে থাকে না। সিংহ, বাঘ, নেকড়ে আদি জন্তুও বড় একটা নেই। এ সব জঙ্গলে গরিলা, শিম্পাঞ্জি, বনমানুষ, এপ্‌ম্যান রাজত্ব করে।

এই অঞ্চলই আমরা গরিলা শিকারের জন্যে মনোনীত করলাম।

আলবার্ট হ্রদে কয়েকখানি সরকারী স্টীমার আছে। তারই মধ্যে একটা ছোট স্টীমার নিয়ে আমরা প্রায় দশজন শিকারী আর কুড়িজন নিগ্রো কুলি শিকারে চললাম।

একটা পুরো দিন আর পুরো রাত আমাদের স্টীমার নদীর ওপর দিয়ে গভীর জঙ্গলের বুক চিরে চলতে লাগলো।

দুই ধারেই বন। মাঝখানে এই নদী! ডেকের উপর বসে বিস্মিত চোখে আমি প্রকৃতির এই গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখতে লাগলাম।

দুইদিনের দিন ভোর পাঁচটার সময় আমাদের স্টীমার কঙ্গো আর শাখা নদীর সংযোগ স্থলে পৌঁছলো। নদীর মাঝখান হতেই দুই পাশের জঙ্গলের নিবিড় নীরবতা দেখে বুঝলাম এইটিই দৈত্য-সম্রাট গরিলাদের রাজধানী।

নদীর মাঝখানে স্টীমারটি নোঙর করে চারখানা জলী বোট নামিয়ে নিলাম। তারপর সকলে নিঃশব্দে তীরের দিকে এগুতে লাগলাম।

তীরে নেমে আমরা খুব সাবধানে চলছি, এমন সময় আমাদের নজরে পড়ল বেবুনের দল।

এই বেবুন আবার চার পাঁচ রকমের। তার মধ্যে একটা জাত ভারী বদ্‌রাগী! তারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধের উপক্রম করতে লাগলো। বিপদে পড়ে আমরাও গুলি চালাতে বাধ্য হলাম। যখন গোটাকতক বেবুন মাটিতে পড়ে ধড়ফড় করতে লাগলো তখন তারা বুঝলো যে ব্যাপার ভাল নয়। কাজেই তখন রণে ভঙ্গ দিয়ে তারা পালাতে আরম্ভ করলে।

আমাদের রাইফেলের গুরুগম্ভীর ধ্বনি নিবিড় জঙ্গলের নীরবতা ভেঙে নিরীহ অধিবাসীদের শান্তিভঙ্গ করে তুললে। চারিদিকে একটা কোলাহল আর বিশৃঙ্খলা জেগে উঠলো। গাছে গাছ শাখার নাচন আর ঝপাঝপ শব্দ হতে বুঝলাম যে শান্তিপূর্ণ জঙ্গলরাজ্যে একটা আকস্মিক অশান্তির সাড়া পড়ে গিয়েছে।

কাছাকাছি একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচেকার ডালে দুটি বনমানুষ আপন মনে দোল খাচ্ছিলো। এমন সময় হঠাৎ কয়েকবার বাজের

মত রাইফেলের শব্দ, বেবুনদের কোলাহল আর মানুষের কণ্ঠস্বর কানে গেল। তারাও খুব চঞ্চল হয়ে পড়লো। তারপরে আমাদের সেই দিকে এগুতে দেখে তারা গাছ হতে লাফিয়ে পড়ে গুটি গুটি সে স্থান ত্যাগ করছিল। দূর হতে তাদের চলন দেখে আমার হাসি পেয়ে গেল। খর্ব্বকায় মানুষের মত দুই পায়ে কেমন গুটি গুটি হাঁটছে, নাদুসনুদুস ভুঁড়িটি কেমন এগিয়ে চলেছে। তার ওপর তাদের গম্ভীর মুখে কি মিটি মিটি চাউনি। যেন তারা নিরীহ, নিপাট ভালমানুষ, জগতের কোন খবরই রাখে না। তাদের দেখলে মানুষ নয় বলে কার সাধ্য ?

সাহেব বললেন, "ওহে : আমাদের পূর্ব্বপুরুষ দুজন রাগ করে চলে যাচ্ছেন। এস তাদের সঙ্গে আলাপ করা যাক।" এই বলেই তিনি রাইফেল তুলে ধরলেন। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বনমানুষ দুটি অতি করুণ আর্ত্তনাদ করে উঠলো। ঠিক যেন মানুষের চীৎকার। তারপর মাটিতে পড়ে কি তাদের ছটফটানি ! আমার মনে ভারী কষ্ট হলো। আহা মিছামিছি এ দুটি নিরীহ জীবকে মেরে কি হলো !

মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। এতদিন শিকার করছি, অসংখ্য জন্তু জানোয়ার মেরেছি। কিন্তু এ রকম মন খারাপ কখনও হয়নি। যা হোক আবার আমরা এগিয়ে যেতে লাগলাম।

কিছু পরেই হঠাৎ একটা গাছের ডাল নীচু হয়ে এল আর সেই ডাল ধরে ঝুলে, দৈত্যের মত একটা ভয়ঙ্কর আকৃতির জীব আমাদের সুমুখে এসে দাঁড়ালো। তাকে দেখেই আমাদের চক্ষু স্থির। মাটি হতে পুরো চার হাত লম্বা, মিশকালো রঙের চেহারা, হৃষ্টপুষ্ট

বিশাল শরীর, প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা গরাণের খুঁটির মত দুই হাত দেখেই আমাদের হাত পা সব যেন অসাড় হয়ে গেল।

সুন্দরবনে পাকুড় গাছের ডালে বসে, অনেক দণ্ড ধরে বাঘের হিংস্র ভাব চোখে দেখেছি। আসামের জঙ্গলে বাঘ আর ভল্লুকের কি বিকট মুখভঙ্গী না দেখেছি। তারপর এই আফ্রিকার জঙ্গলে দুটি যুদ্ধরত সিংহের বিভীষিকামাখা মুখও চোখে পড়েছে, কিন্তু আজ যে ভয়ঙ্কর মুখখানা দেখলাম তার কাছে সে সব কিছুই নয়। এর সারা মুখে যেন দানব আর রাক্ষসের সবটুকু জিঘাংসা মাখানো রয়েছে। কি ভীষণ এর দাঁত খিচুনী! কি ভীষণ ভ্রূকুটি এর কপালে! এর দুটো চোখ যেন আগুনের ভাঁটা, আর তা থেকে বিদ্যুতের তেজ ছুটে বেরুচ্ছে। জঙ্গলের দৈত্য সম্রাটের মত সে যেন আমাদের অনধিকার প্রবেশের কৈফিয়ৎ চাইবার জন্যে এমন রুদ্রভাবে আমাদের সুমুখে এসে দাঁড়ালো।

হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে গেলেও নিমেষে আমরা নিজেদের সামলে নিলাম। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সকলেই সেটাকে গুলি করবার জন্যে রাইফেল তুললাম। কিন্তু কি ভয়ানক যে গরিলার ক্ষিপ্রকারিতা তা ভাষায় বলে বোঝানো যায় না।

আমরা রাইফেল তুলে লক্ষ্য ঠিক করে, গুলি ছোঁড়বার আগেই সে প্রায় দেড়শো হাত ব্যবধান অতিক্রম করে আমাদের ওপর এসে পড়লো! আমরা পাঁচ ছয় জনে গুলি ছুঁড়েছিলাম। সেটা ছুটে আসতে আসতেই তার মধ্যে দু তিনটে গুলি তার গায়ে বিঁধেছিলো কিন্তু একটা ছাড়া আর কোনটাই তেমন সাংঘাতিক স্থানে লাগেনি।

তিনটি গুলি উপেক্ষা করেও সে রাক্ষসের মত আমাদের দলে এসে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে দুই থাপ্পড়ে দুজন শিকারীর নাড়িভুঁড়ী বার করে দিলে। আরও দুজনকে সে আক্রমণ করতেই আমরা আবার গুলি ছুঁড়লাম। গুলি তার মাথায় গিয়ে বিঁধলো। ভীষণ আর্ত্তনাদ করতে করতে মাটিতে পড়বার আগেই সে আরও দুজন শিকারীকে সাংঘাতিক ভাবে জখম করে ফেললে। তারপর মাটিতে পড়ে ছটফট করতে করতেও একটা রাইফেলের নল চিবিয়ে চেপ্টা পাত করে ফেললে।

কুলিগুলো প্রাণ ভয়ে দূরে পালিয়েছিলো। সেটা মরতে তবে তারা ফিরে এল।

আহত সাহেব শিকারী দুটি ততক্ষণে মারা গেছেন। চারজন শিকারীকে হারিয়ে আমরা উদ্যম ভঙ্গ হয়ে পড়লাম। বাপরে! এর নাম গরিলা শিকার! এতগুলো শিকারী মিলে একটা গরিলা মারতে গিয়ে যখন এই বিপদ, তখন এক সঙ্গে চার পাঁচটা গরিলা থাকলে তো রক্ষে ছিলো না।

সাহেব বললেন, 'শিকার বন্ধ করা যাক্। মৃত শিকারীদের দেহ পচবার আগে তাঁদের ইউগ্যাণ্ডায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে! এখানে আর বিলম্ব করা মোটেই চলবে না।"

তারপর আমরা ইউগ্যাণ্ডায় ফিরে এলাম। শিকারী সাহেবদের কবর দেওয়া হল। এবং তখনকার মত আমরা শিকার ত্যাগ করলাম।

সাহেবের ছুটি ফুরিয়ে গেল। তিনি আফ্রিকার দক্ষিণ অঞ্চলে সারভে অর্থাৎ জরীপ কাজে লেগে গেলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে

চললাম। এই কয় বৎসর আফ্রিকা, মেসোপটেমিয়া, আরও দুই এক স্থানে কাজ করে বেড়িয়েছি। দীর্ঘকাল পরে এক বৎসরের ছুটি নিয়ে দেশে এসেছি, তাই তোমরাও আমার সেই সব দুঃসাহসের কথা শুনতে পেলে।"

ঝণ্টুদার কাহিনী শেষ হলেই আমরা তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বললাম—"আশীর্ব্বাদ করো ঝণ্টুদা! আমরা যেন তোমারই মত সাহসী হতে পারি।"

সমাপ্ত